গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৯ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ২৭ এপ্রিল - ৩ মে ২০০৭ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠা দিবসে

বিশাল জনসমাবেশে বৃহত্তর আন্দোলনের আহ্বান

২৪শে এপ্রিল এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠা দিবসে কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে বিশাল সমাবেশের একাংশ। ইনসেটে ভাষণ দিচ্ছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

বাঁশবেড়িয়া গ্যাঞ্জেস জুট মিলে ইতিহাস গড়ছেন শ্রমিকরা

নন্দীগ্রামের কৃষকরা সৃষ্টি করেছেন ইতিহাস। পাশাপাশি, এ রাজ্যে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে হুগলির বাঁশবেড়িয়া গ্যাঞ্জেস জুট মিলের শ্রমিকরাও ইতিহাস গড়ে তুলেছেন, যা সংবাদমাধ্যমে সেভাবে প্রচারিত না হওয়ায় থেকে গেছে অনেকটা মানুষের অগোচরে, অলক্ষ্যে। গত ৪ নভেম্বর থেকে প্রায় ৬ মাস হতে চলল, অনাহার-অর্ধাহার, পুলিশ-প্রশাসনের ধমকি, গুণ্ডাদের আক্রমণ, কেন্দ্রীয় ৭টি ট্রেড ইউনিয়নের বিশ্বাসঘাতকতাকে উপেক্ষা করে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন প্রায় চার হাজার গরিব চটকল শ্রমিক। এত দীর্ঘকালীন ধর্মঘট জুট-শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে আগে কখনও হয়নি। সম্প্রতি জুটমিল কর্তৃপক্ষ কারখানার অপর ইউনিটে 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক' নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়ায় তা সংবাদ হিসাবে মিডিয়ায় প্রচার লাভ করেছে, সেই সঙ্গে বলা হচ্ছে — এর আর একটি ইউনিটে শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে ধর্মঘট চালাচ্ছে। ব্যস, এই পর্যন্তই। কিন্তু এই দীর্ঘকালীন ধর্মঘটের নেপথ্যে কী আছে, ৬ মাস কারখানায় কাজ না থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকরা অনাহার-অর্ধাহারকে সঙ্গী করে কীভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন — ক'জন জানেন তার খবর! ধর্মঘটের শুরুতে গণদাবীর পাতায় এঁদের সংগ্রামের কথা তুলে ধরা হয়েছিল। 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক' জারির আগের দিনই ১৮ এপ্রিল গণদাবীর প্রতিনিধি আবারও বাঁশবেড়িয়া গিয়েছিলেন শ্রমিকদের কাছে। সেখানে গিয়ে যা দেখা গেল, তা সত্যিই প্রেরণাদায়ক। কারখানায় কাজ হচ্ছে না, শ্রমিক পরিবারগুলিতে চরম দারিদ্র্য। আন্দোলনকারী শ্রমিকরা নিজেদের এক বেলার যৌথ রান্নাঘরে কখনও একবেলা খেতে পাচ্ছেন, কখনও বা তাও জুটছে না। অনেকেই নিজেদের অনাহারী পরিবারের দিকে তাকাবারও ফুরসত পাচ্ছেন না। শ্রমিক আন্দোলনকে জীবন্ত

ছয়ের পাতায় দেখুন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯টি আসনে জয়ী এ আই ডি এস ও

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ডি এস ও-র তাৎপর্যপূর্ণ জয় এস এফ আই-এর এযাবৎ 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ে'র মুখোশ খুলে দিল। বছরের পর বছর তারা শাসক দল ও কর্তৃপক্ষের যোগসাজসে বিশ্ববিদ্যালয় অভ্যন্তরে ছাত্রদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে, মারধোর করে, রেজাল্ট খারাপ করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে, নির্বাচনের নোটিশ সম্পর্কে সাধারণ ছাত্রদের অন্ধকারে রেখে, নমিনেশন পত্র তুলতে না দিয়ে, স্ক্রুটিনি টেবিলে বিরোধীপক্ষকে থাকতে না দিয়ে, বিরোধীপক্ষের প্রার্থীর নমিনেশনপত্র বিনা কারণে বাতিল করে যেভাবে ছাত্রসংসদ দখল করত — তার বিরুদ্ধে ছাত্রদের ক্ষোভ ছিলই। এবারে নির্বাচনে ছাত্ররা যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারে, সেজন্য কর্তৃপক্ষের যোগসাজসে এসএফআই বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। যে সব ছাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিল তাদের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে নানা ভাবে ভয় দেখিয়ে, ফোন করে ভবিষ্যৎ বরবাদ করে দেবার হুমকি দিয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ছাত্রদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, প্রতিবাদ করেছে, ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও'র প্রার্থী হয়ে এস এফ আই-এর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। বিশেষ করে সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামের কৃষকদের লড়াই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার যে প্রেরণা দিয়েছে, সাহস যুগিয়েছে তার প্রভাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও দেখা গেছে। এস এফ আই-এর সন্ত্রাসের সামনে দাঁড়িয়ে ডি এস ও-র প্রতিনিধি হিসাবে ছাত্ররা যে ক'টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, তার বেশিরভাগ আসনেই সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়ে মোট ১৯টি আসনে জয়ী হয়েছে। আলিপুর ক্যাম্পাসে এস এফ আই-এর সমস্ত রকম ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে ছাত্ররা ১৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পেরেছে ও ১০টি আসনে এ আই ডি এস ও এবং ২টি আসনে এ আই ডি এস ও সমর্থিত নির্দল প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে। কলেজ স্ট্রীট ক্যাম্পাসেও ১৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এ

পাঁচের পাতায় দেখুন

নন্দীগ্রামে গণহত্যার প্রতিবাদে চাষীদের পাশে দাঁড়াল যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ

নন্দীগ্রামে নারী-শিশু সহ গণহত্যা, নারী ধর্ষণ ও বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ২৭ মার্চ কলকাতায় 'যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ'র উদ্যোগে সহস্রাধিক সরকারি-আধাসরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের এক বিশাল ধিক্কার মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির দিকে এগোলে চৌরঙ্গিতে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। মাতঙ্গিনী মূর্তির পাদদেশে যেতে দেওয়া হবে না বললে কর্মচারী ও শিক্ষকরা প্রতিবাদে ফেটে পড়েন এবং চৌরঙ্গি মোড়েই সভা করে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করা হয়। পরদিন ২৮ মার্চ ফটিক দে, সাধন রায়, বিমল জানা, সুব্রত ভট্টাচার্য, অশোক মাইতি, মনোজ চক্রবর্তী, রঞ্জিত রায় প্রমুখ ৭ জনের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের সাথে দেখা করে স্মারকলিপি পেশ করেন ও দাবি করেন — নন্দীগ্রামে গণহত্যা ও পাশবিক অত্যাচারের জন্য দায়ী মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য সকলকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, নিহত ও আহতদের পরিবারের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, প্রতিটি অত্যাচারিতের সরকারি ব্যয়ে যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা, কৃষিজমি জোর করে কেড়ে নেওয়া বন্ধ, এস ই জেড পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে।

নন্দীগ্রামে গণহত্যার প্রতিবাদে শুধু মিছিল-মিটিং নয় — অত্যাচারিতের পাশে দাঁড়াতে গত ৭ এপ্রিল যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের পক্ষ থেকে কার্ত্তিক সাহা, বিমল জানা, অর্জুন সেনগুপ্ত ও পার্থ চ্যাটার্জী সহ ১২ জনের এক প্রতিনিধি দল নন্দীগ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন। তাঁরা প্রথমে যান নন্দীগ্রাম হাসপাতালে, সেখান থেকে চৌরঙ্গি মোড়, রাজারামচক, ভূতা মোড়, গড়চক্রবেড়িয়া হয়ে সোনাচূড়ায়। সর্বত্র বয়স্কা মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষ এগিয়ে এসে কথা বলেন এবং তাঁদের সংগ্রামী মানসিকতা ব্যক্ত করেন। প্রতিনিধিরা তাঁদের আন্দোলনে সমস্ত রকম সাহায্যের আশ্বাস দেন এবং মঞ্চের পক্ষ থেকে নিহত ও নিখোঁজদের পরিবারের জন্য এবং আহতদের চিকিৎসার সাহায্যার্থে প্রাথমিকভাবে ১৬ হাজার টাকা ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির বিশিষ্ট নেতা ভবানী প্রসাদ দাস ও অন্যতম আহ্বায়ক নন্দ পাত্রের হাতে তুলে দেন। পরে আরও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসেন। প্রতিনিধি দলের অন্যতম নেতা বিমল জানা বলেন — নন্দীগ্রামে গণহত্যার ঘটনা বীভৎসতায় ও পাশবিক অত্যাচারে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। জালিয়ানওয়ালাবাগে দলীয় ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী দিয়ে হত্যা কিংবা নারীধর্ষণ ও অত্যাচারের ঘটনা শোনা যায়নি।

কাকদ্বীপে লাগামছাড়া ভাড়াবৃদ্ধি, তীব্র ক্ষোভ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপে ৯৪নং বাসরুটে (নামখানা-৮নং লট) সরকারি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাসমালিকরা যাত্রীদের পকেট কেটে বছরের পর বছর বিপুল বাড়তি ভাড়া আদায় করে চলেছে এবং সবটাই করে চলেছে আরটিএ'র ছাপমারা ভাড়া তালিকা দেখিয়ে। সিপিএম পার্টি, সরকার, প্রশাসন নীরব থেকে এই বেআইনি ও অন্যায় লুণ্ঠন চলতে দিচ্ছে। গত ১০ জানুয়ারি মালিক নতুন করে আরও বাড়তি ভাড়া যাত্রীদের ঘাড়ে চাপিয়েছে। নামখানা থেকে ৮নং লট পর্যন্ত ২২ কিমি রাস্তায় সরকারি নিয়মানুযায়ী যেখানে বাসভাড়া হওয়ার কথা ৭ টাকা, সেখানে মালিকরা আদায় করছে ১০ টাকা। নামখানা-কাকদ্বীপ বিডিও অফিস (১৬ কিমি) পর্যন্ত সাড়ে ৫ টাকার স্থলে ৮ টাকা, নামখানা-স্টেট পোলট্রিফার্ম (১২ কিমি) পর্যন্ত ৫ টাকার স্থলে সাড়ে ৬ টাকা, নামখানা-রায়বাড়ি (৮ কিমি) পর্যন্ত সাড়ে ৪ টাকার স্থলে সাড়ে ৫ টাকা।

এ নিয়ে যাত্রী বিক্ষোভ প্রচণ্ড। প্রতিবাদে গড়ে উঠেছে 'পরিবহন যাত্রী কমিটি'র কাকদ্বীপ শাখা। এই কমিটির নেতৃত্বে ৩ মাসব্যাপী চলছে প্রতিবাদ আন্দোলন। এসডিও অভিযান, পথ অবরোধ, সাইকেল মিছিল, কনভেনশন ইত্যাদি চলছে। এসডিও স্বয়ং ১১ এপ্রিল উকিলের হাট স্টপেজে পথ অবরোধস্থলে হাজির হয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যাত্রী কমিটির উপস্থিতিতে ২১ এপ্রিল ভাড়া সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা করে সমাধানের ব্যবস্থা করবেন।

হাবড়ায় খেতমজুরদের বিক্ষোভ ডেপুটেশন

খেতমজুরদের বছরে ১০০ দিনের কাজ সুনিশ্চিত করা ও সমস্ত গরিব মানুষের নাম বিপিএল তালিকায় নথিভুক্ত করে রেশনকার্ডের দাবিতে ৯ এপ্রিল উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়ায় কুমড়ো কাশীপুর পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নেতৃত্বে ঐ কর্মসূচিতে কুমড়ো অঞ্চলের প্রায় দেড় শতাধিক খেতমজুর অংশগ্রহণ করেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন হাবড়া ব্লক-১ এ আই কে কে এম এসের সম্পাদক কমরেড উৎপল সিন্‌হা। তিনি খেতমজুরদের সংগঠিতভাবে দাবিগুলি নিয়ে দীর্ঘ লড়াই গড়ে তোলা এবং কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করার আবেদন জানান।

মধ্য কলকাতায় স্বাস্থ্য শিবির

চিকিৎসার মতো অতি প্রয়োজনীয় পরিষেবাটিকেও আজ সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে গেছে বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের সরকারি নীতি। এই অবস্থায় দুঃস্থ রোগীদের কাছে বিনামূল্যে চিকিৎসা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে মধ্য কলকাতা পরীক্ষা পরিচালন সহায়ক কমিটি (প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ, পঃবঃ-এর অধীন) ৮ এপ্রিল কলকাতার হরিনাথ দে রোডে একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করে। শিবির উদ্বোধন করেন অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার। মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরার নেতৃত্বে ৩ জন চিকিৎসক ও ৩ জন প্যাথলজিস্ট ২৫০ জন রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ওষুধ দেন। স্বাস্থ্যশিবির সংগঠিত করা ও পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এলাকার অধিবাসীদের ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ করা গেছে।

দক্ষিণ দিনাজপুরে কৃষিজমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে ডেপুটেশন

নন্দীগ্রাম গণহত্যার প্রতিবাদে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের এস ইউ সি আই কর্মী-সমর্থক সহ শতাধিক সাধারণ মানুষ বিডিও'র কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয় — কোনও অজুহাতে কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়া চলবে না, নিহত ও আহত চাষীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, নন্দীগ্রামের ঘটনায় দোষী পুলিশ ও সিপিএম ক্রিমিনালদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এছাড়া এলাকায় রেশন কার্ড ও বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়ার পদ্ধতি সরল করার এবং একশো দিনের কাজের টাকা অবিলম্বে প্রদান করার দাবিও জানানো হয়। বিষয়গুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে সমাধানের আশ্বাস দেন বিডিও। এরপর একটি সুসজ্জিত মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে।

ওড়িশার জাজপুরে রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

বক্তব্য রাখছেন কমরেড তাপস দত্ত

ওড়িশার জাজপুর জেলার চিকারা ব্লকে ১৭, ১৮, ১৯ মার্চ জেলাভিত্তিক একটি রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবির পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক কমরেড তাপস দত্ত। শিবিরের আলোচ্য বিষয় ছিল, নেতা-কর্মীদের সকলরকম ত্রুটি-দুর্বলতা থেকে মুক্ত করে দলকে আরও সংহত ও শক্তিশালী করা। এ প্রশ্নে কমরেড তাপস দত্তের আলোচনা ও আহ্বান উপস্থিত নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তিন দিনের শিবিরের আলোচনায় কমরেড দত্তকে সহায়তা করেন রাজ্য কমিটির সদস্যবৃন্দ — কমরেডস্ শঙ্কর দাশগুপ্ত, সদাশিব দাস, দীনবন্ধু সাহু ও জগবন্ধু বড়াল।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভা সমাপ্ত হয়।

আন্দোলনের চাপে পুরুলিয়ায় শিল্প স্থাপনের দাবি আদায়

এস ইউ সি আই দীর্ঘদিন ধরেই পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের অনুর্বর টাঁড় জমিতে শিল্প-কলকারখানা গড়ার দাবিতে আন্দোলন করে আসছিল, কিন্তু সে দাবি উপেক্ষিতই হতে থাকে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে শিল্পায়নের অজুহাতে বিপুল পরিমাণে উর্বর কৃষিজমি অধিগ্রহণ করতে গেলে জনগণের প্রবল প্রতিরোধের সামনে পড়ে রাজ্য সরকার। অবশেষে পুরুলিয়ার আন্দোলনের চাপে অনিচ্ছুক রাজ্য সরকার রঘুনাথপুরের কাছে নতুনডি, খাজুরা ও বেড়ো অঞ্চলের ১২টি মৌজার ৬০০০ একর অনুর্বর ও টাঁড় জমিতে জয় বালাজি গ্রুপের বার্ষিক ৫০ লক্ষ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ইস্পাত শিল্প করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রথমদিকে এই প্রকল্পে জনগণের দাবি না মেনে অনেক বেশি পরিমাণ বাস্তু ও কৃষিজমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত করলে এস ইউ সি আই পুরুলিয়া জেলা কমিটির উদ্যোগে বাস্তু ও কৃষিজমি রক্ষা, ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু হয়। দীর্ঘ চার মাস আন্দোলনের পর অবশেষে জনগণের দাবি আদায় হ'ল। প্রথম দিকে প্রশাসন সর্বদলীয় মিটিংগুলিতে পরিকল্পনা করে এস ইউ সি আই-কে বাদ দেয় কিন্তু আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত ডাকতে বাধ্য হয়। গত ১০ এপ্রিলের সর্বদলীয় মিটিংয়ে এস ইউ সি আইকে গুরুত্ব দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হলে দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ভাস্কর ভদ্র ও জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বিজয় বাউরী উপস্থিত থাকেন। তাঁরা সভায় শিল্পহীন পুরুলিয়ায় শিল্পস্থাপনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে জমি চিহ্নিতকরণ, ক্ষতিপূরণ ও কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্ট দাবি ও প্রস্তাব রাখেন। সেগুলি হ'ল — (১) প্রস্তাবিত কারখানার মধ্যে কত পরিমাণ জমি, কোন্ কোন্ মৌজা ও প্লট পড়ছে তা চিহ্নিত করে ম্যাপে দেখাতে হবে। এই কারখানা যতটা সম্ভব বাস্তু ও কৃষিজমি বাঁচিয়ে পতিত ও অকৃষি জমিতে করতে হবে। (২) জমির মালিকদের কাছ থেকে যে জমি নেওয়া হবে, ডেসিমেল প্রতি সেই জমির দাম নির্ধারণ করতে হবে, বাস্তুর ক্ষতিপূরণ কী হবে তাও উল্লেখ করতে হবে। বাস্তু উচ্ছেদ হলে বাস্তুচ্যুতদের উচ্ছেদ এলাকার সন্নিকটস্থ সরকারি অথবা বেসরকারি জমি উপযুক্ত পরিমাণে দিতে হবে। (৩) জমি থেকে যাঁরা উচ্ছেদ হবেন তাঁদের ও স্থানীয় দক্ষ-অদক্ষ বেকারদের কর্মসংস্থানে অগ্রাধিকার দিতে হবে; এস্থলে বয়সের সিনিয়রিটিকে ভিত্তি করতে হবে। তবে একইসঙ্গে তাঁরা এও বলেন যে, ক্রমবর্ধমান বাজার সঙ্কটের এই যুগে ১৮ হাজার কোটি টাকার এই বিশাল প্রকল্পের রূপায়ণ আদৌ কেমন হবে, কত লোকের কর্মসংস্থান হবে সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন থাকতে হবে।

খড়্গপুর কৃষিজমি বাঁচাও কমিটির জাতীয় সড়ক অবরোধ

খড়্গপুরে কৃষিজমি বাঁচাও কমিটির নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনের চাপে খড়্গপুর গ্রামীণ এলাকার জফলা, ঘোলাগেড়িয়া সহ পাঁচটি মৌজার ৮৪০ একর কৃষিজমি অধিগ্রহণ থেকে রাজ্য সরকার পিছু হটলেও রূপনারায়ণপুর, মালিপুর, জিজারপুর, বড়াডিহা এই চারটি মৌজার ৪৪০ একর কৃষিজমি অধিগ্রহণের নোটিশ জারি হয়েছে। প্রশাসনের কাছে আপত্তি জানানো সত্ত্বেও এভাবে নোটিশ জারি হওয়ায় ক্ষুব্ধ চাষীরা ১৭ এপ্রিল বেলা ১১টা থেকে কৃষিজমি বাঁচাও কমিটির মুখ্য উপদেষ্টা পঞ্চানন প্রধান, সভাপতি গৌরহরি ঘোষ ও সম্পাদক বিবেকানন্দ সাহুর নেতৃত্বে ৬নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। অবরোধ চলাকালীন বিক্ষোভ সভা থেকে অবিলম্বে নোটিশ প্রত্যাহারের দাবি করা হয়। বক্তারা পার্শ্ববর্তী সরকারি খাস জমি ও অকৃষি জমিতে প্রস্তাবিত শিল্প স্থানান্তরিত করার দাবি করেন। জমি অধিগ্রহণের শুনানি বয়কটেরও ডাক দেওয়া হয়। অবরোধে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন প্রাণতোষ মাইতি, সভাপতি মৃগেন মাইতি, খড়্গপুর পুরসভার বিরোধী দলনেতা জহরলাল পাল, কাউন্সিলর দেবাশিস চৌধুরী প্রমুখ।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং

পুঁজিবাদী লুণ্ঠনেরই ভয়াবহ পরিণাম

বিশ্বের ১১৩ টি দেশের সেরা পরিবেশ বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে সমবেত হয়েছিলেন, 'বদলে যাওয়া প্রাকৃতিক পরিবেশ ও তার কারণ' শীর্ষক গবেষণাধর্মী রিপোর্ট তৈরি করার জন্য। গত ২ ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞানীদের সেই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তারপর থেকে এ নিয়ে নানা পর্যালোচনা চলছে, কারণ রিপোর্টটা গুরুত্বপূর্ণ। ভয়াবহ বিপদসঙ্কেত শুনিয়েছেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। বলেছেন, বিশ্বের তাপমাত্রা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়ছে। উত্তর ও দক্ষিণের মেরু অঞ্চলের হিমবাহ গলে যাচ্ছে। যন্ত্রশিল্প পূর্ববর্তী বিশ্বের গড় তাপমাত্রার ওপর আর ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাই হচ্ছে চূড়ান্ত লক্ষ্মণরেখা। ইতিমধ্যেই ০.৮ ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়ে গেছে; আরও ০.২ ডিগ্রি বৃদ্ধি পাওয়ার পথে। প্যারিস সম্মেলনের বিজ্ঞানীরা জানিয়ে দিয়েছেন, বর্তমান হারে যদি তাপমাত্রা বাড়তেই থাকে তবে এই শতকের শেষে সম্ভাব্য গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াবে ৬.৪ ডিগ্রি। এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি আমাদের এই উষ্ণমণ্ডলীয় দেশের তাপমাত্রার আরও অনেক বেশি বৃদ্ধি ঘটাবে। এইভাবে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বিশ্বের অধিকাংশ জীবের সহনশীল মাত্রাকেও ছাড়িয়ে যাবে, মেরু অঞ্চলের বরফ হু-হু করে গলতে শুরু করবে। সেই জল গিয়ে মিশবে সমুদ্রে। তাতে সমুদ্রের জলতল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। ইতিমধ্যে বিশ শতকেই জলস্তর বৃদ্ধি ৬ থেকে ৯ ইঞ্চি পর্যন্ত ঘটে গিয়েছে। ৯০ বছর বাদে দেখা যাবে, সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বেড়ে যাবে আরও ৭ থেকে ২৩ ইঞ্চি। জলের তলায় চলে যাবে সমুদ্র উপকূলস্থ বহু দেশ ও এলাকা। ইতিমধ্যেই প্রকৃতির ভারসাম্য বিপন্ন। বৃষ্টি ও শীতের স্বাভাবিকতা থাকছে না। একদিকে প্রবল বর্ষণ ও বন্যা, অন্যদিকে ভয়াবহ খরা গ্রাস করছে পৃথিবীকে। উত্তর আমেরিকা মহাদেশের ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় সহ উষ্ণমণ্ডলীয় তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ ও সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটছে। ভীষণ তাপ, তাপপ্রবাহ, ভারি শিলাবৃষ্টির ঘটনা বাড়ছে, আরও বাড়বে। এমন ওজনের শিলা এখনই পড়ছে, যা আগে পড়তে কেউ দেখেনি। অস্বাভাবিক কুয়াশা ও ধোঁয়াশায় ঢেকে থাকছে পৃথিবী। শস্য উৎপাদনেও পড়ছে এসবের প্রভাব। উৎপাদন মার খাচ্ছে। ২০৩০ সাল নাগাদ প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের ৪০টি প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা, কারণ, বর্ধিত উত্তাপে এই প্রজাতিগুলির রক্ষাকারী ইকোসিস্টেম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

উত্তাপ বাড়ছে, বাড়ছে জীবাণু ও ভাইরাসের প্রকোপ

বিজ্ঞানীদের হুঁশিয়ারি— উত্তাপ আরও বাড়লে নতুন নতুন ভয়াবহ জীবাণু ও ভাইরাসের প্রকোপ বাড়বে; জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধির হার বাড়বে। এখনই দেখা যাচ্ছে, পরিবেশের পরিবর্তনে বিভিন্ন রোগ-জীবাণুর গঠনগত ও চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটছে, অনেক উপকারী জীবাণুও প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে, এবং আবহমণ্ডল আরও উত্তপ্ত হলে অন্যান্য উপকারী ও সাধারণ জীবাণুও কালান্তক প্রাণঘাতী জীবাণুতে পরিণত হবে। সম্প্রতি জীবাণুবিদরা জানিয়েছেন ঃ সাধারণত মানবদেহের অন্ত্রে থাকে 'ব্যালান্টিডিয়াম কোলাই' নামের একটি জীবাণু। হালকা ধরনের অ্যামিবায়োসিস ছাড়া ঐ জীবাণুর আর কোনও ক্ষতিকারক ভূমিকা ছিল না। কিন্তু তারাই এখন ফুসফুসের সংক্রমণ ঘটাচ্ছে। তার ফলে শুকনো কাশি ও হাঁপানি হচ্ছে। আক্রান্তদের কফে পাওয়া যাচ্ছে তার জীবাণু। 'ব্লাস্টোসিস্টিস হোমিনিস' জীবাণুটি থেকে সংক্রমণের তেমন কোন ভয় ছিল না। কিন্তু এখন তারা জটিল ডায়েরিয়ার সৃষ্টি করছে। 'প্লাজমোডিয়াম ভাইভাক্স' ছিল সাধারণ ম্যালেরিয়ার জীবাণু; রক্তপরীক্ষায় এই জীবাণু দেখেও চিকিৎসকরা তেমন গা ঘামাতেন না। কিন্তু ঐ জীবাণুই এখন জটিল ম্যালেরিয়া তৈরি করে মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনছে (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ মার্চ ২০০৭)। শুধু তাই নয়, শস্য উৎপাদনের পক্ষে ক্ষতিকর ভাইরাসের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে, বেড়ে চলেছে ভাইরাসদের ক্ষতি করবার ক্ষমতাও।

বিশ্বের বিজ্ঞানীমহল এবং শিক্ষিত মানুষজন যথেষ্ট চিন্তিত। কারণ, এটা কোন বিশেষ দেশের সমস্যা নয়; বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক বা ইন্টারন্যাশানাল বিষয় নয়, এটা এমন সমস্যা যা একই সঙ্গে দেশ-জাতি-রাষ্ট্র নির্বিশেষে সর্বাত্মক, কেউ বাদ পড়ছে না।

তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ

কিন্তু পৃথিবীর তাপমাত্রার এই ব্যাপক বৃদ্ধির কারণ কী? বিজ্ঞান কী বলছে? বিজ্ঞান বলছে— বিশ্বে আলো ও তাপের উৎস সূর্য। সেখান থেকে আলো ও তাপ বায়ুস্তর ভেদ করতে করতে ভূপৃষ্ঠে আসছে। ভূপৃষ্ঠ তার দ্বারা আলোকিত হচ্ছে, তার থেকে তাপ সংগ্রহ করছে; জীবজগৎ সেই তাপ ও আলোর সাহায্যে বেঁচে আছে। আবার এই ভূপৃষ্ঠেরও গৃহীত তাপের কিছু পরিমাণ বিকিরণ ঘটে। সেই তাপ ওপরের দিকে বিকীর্ণ হয়ে বায়ুস্তরে প্রবেশ করে। তার একটা বড় অংশ মহাশূন্যে মিশে যায়, বাকি অংশ বায়ুর জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে শোষিত হয়ে পুনরায় তাপশক্তি হিসাবে নীচের দিকে প্রতিফলিত হয়ে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলকে উষ্ণ করে। এটা প্রাকৃতিকভাবে এক ধরনের স্বাভাবিক গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া। এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যদি না থাকতো, তবে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা হত অত্যন্ত কম (-৭৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)। তখন সাগরও জমে বরফ হয়ে যেত, প্রাণের অস্তিত্ব থাকতো না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যানবাহন ও কল-কারখানার কাজে ব্যবহৃত খনিজ তেল, কয়লা ইত্যাদি লাগামছাড়া হারে পোড়ানোর ফলে ব্যাপকহারে সৃষ্ট কার্বনডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইডের মত সর্বনাশা গ্রিনহাউস গ্যাস প্রধানত ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন ১০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুস্তরে এত বিপুল পরিমাণে সঞ্চিত হচ্ছে যে, ব্যাপক গ্রিনহাউস গ্যাসের তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিচ্ছে। ভূপৃষ্ঠের বিকীর্ণ উত্তাপ বাইরে বেরিয়ে যেতে পারছে না। প্রায় পুরোটাই ফিরে এসে পৃথিবীর জল-স্থল-বায়ুকে ক্রমাগত উত্তপ্ত করে তুলছে এবং যত দিন যাচ্ছে, এই গ্রিনহাউস গ্যাসের স্তর আরও অনেক বেশি ঘন হয়ে উঠছে। সেকারণেই বেড়ে চলেছে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা। গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব-উষ্ণায়ন তারই অনিবার্য পরিণাম।

শুধু তাই নয়, ফ্রিজ, এয়ারকণ্ডিশনার ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহারে বায়ুমণ্ডলে বেড়ে যাচ্ছে ধ্বংসাত্মক ক্লোরো-ফ্লুরো-কার্বনের পরিমাণ। এই যৌগ বায়ুমণ্ডলের ওপরের দিকে ৩৫ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে; আমাদের মাথার ওপর ৩৫-৩৮ কিমির মধ্যে বর্মের মত ঘিরে থেকে জীবজগৎকে রক্ষা করছে যে অতিপ্রয়োজনীয় ওজন গ্যাসের স্তর— তাকে ক্ষইয়ে দিচ্ছে, ফুটো করে দিচ্ছে এবং তার ভেতর দিয়ে সূর্যের অত্যন্ত ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি (আলট্রাভায়োলেট রে) সরাসরি ঢুকে পড়ছে পৃথিবীতে; সৃষ্টি করছে ক্যান্সার সহ দুরারোগ্য ব্যাধির। অর্থাৎ প্রাণীজগৎ ভীষণভাবে বিপন্ন; অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলছে, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই পৃথিবীর তাপমাত্রা কখনো খানিক বেড়েছে, কখনো কমেছে। এমনকী 'আইস এজ' বা হিমযুগও এসেছে। আবার সেই হিমযুগ চলে গিয়েছে। ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার হেরফেরটা অস্বাভাবিক বিষয় ছিল না। নগরসভ্যতা ও আধুনিক জীবনের বিকাশপর্বে শিল্প-কারখানা ও যানবাহনের আবির্ভাব ঘটেছে; কয়লা ও খনিজতেলের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে; বন-জঙ্গল কাটাই করতে হয়েছে। মানবসভ্যতার প্রয়োজনেই এতকাল হয়েছে এসব। অনেক প্রাচীন গ্রামকেন্দ্রিক ও নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার কথা জানা যায়, যারা নিজেদের বসতিস্থাপন ও খাদ্য উৎপাদন করতে গিয়ে প্রকৃতির ওপর এমন সব পরিবর্তন ঘটিয়েছিল— যার প্রতিক্রিয়ায় ব্যাপক খরা ও বন্যা দেখা দেয় এবং তাতে শেষপর্যন্ত সভ্যতাগুলি পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে মুছে গেছে। কিন্তু তারা এর কারণটি ধরতে পারেনি, যা আমরা আজ বুঝতে পারি। এই কারণটি বোঝার জন্য যে চেতনা দরকার তা সেদিন মানুষের মধ্যে সৃষ্টিই হয়নি। ফলে সেই পর্যায়ে পরিবেশের যা ক্ষতি হয়ে গেছে তা অনেকটা অজান্তেই। শিল্পবিপ্লবের পর মানুষ এই ক্ষতিটা মোটা দাগে টের পেল বিংশ শতাব্দীতে এসে। অফিসিয়ালি এটা স্বীকৃত হল ৫০-এর দশকে স্টকহোম সম্মেলন থেকে।

বর্তমান উত্তাপ বৃদ্ধির গ্রাফ কেবলই ঊর্ধ্বমুখী

বিগত কয়েক দশক ধরে পৃথিবীর উত্তাপ লক্ষণীয় দ্রুতগতিতে বাড়ছে। এই উত্তাপ বৃদ্ধি পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার স্বাভাবিক হেরফেরের পর্যায়ে পড়ছে না। উত্তাপবৃদ্ধির গ্রাফ বা রেখাচিত্র কেবলই ঊর্ধ্বমুখী। শুধু বাড়ছেই এবং তার প্রতিক্রিয়ায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য দারুণভাবে বিঘ্নিত হওয়াটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক স্তরে পৌঁছে গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা বিশ্ববাসীকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, আবহমণ্ডলে ভয়াবহ পরিবর্তন ঘটছে এবং এটা এখন অত্যন্ত মোটা দাগে স্পষ্ট আকারে দেখা যাচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, কোন সাধারণ প্রাকৃতিক কারণে এই উষ্ণায়ন এবং ওজন গ্যাসের সর্বনাশ ঘটছে না, এটা ঘটছে মানুষের বিশেষ কার্যাবলীর কারণেই।

প্রকৃতির অন্ধ অনুসারী হলে মানুষ থাকত আদিম মানুষের স্তরে

তাহলে উপায়? অনেকে ভাবেন, প্রকৃতির চলার পথে মানুষ বাধা সৃষ্টি করেছে। তাই নেমে আসছে প্রকৃতির অভিশাপ। প্রকৃতিকে তার নিজের পথে চলতে দেওয়া উচিত। প্রকৃতিকে নিজেদের কাজে লাগানোর চেষ্টায় বড় মাপের হস্তক্ষেপ থেকে মানুষকে বিরত থাকতে হবে। এঁদের মধ্যে বহু বিজ্ঞানী আছেন, দার্শনিক আছেন, পরিবেশবিদ আছেন, শিক্ষিত মানুষ এবং সাধারণ মানুষও আছেন। কিন্তু এটা তো অবিসংবাদিত সত্য যে, মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করেই পশু থেকে মানুষে উত্তীর্ণ হয়েছে। ক্রমে ক্রমে মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটেছে, চিন্তা-চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। তার ভিত্তিতে প্রকৃতির নিয়মকে আবিষ্কার করে সেই নিয়মকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে চলেছে মানবসভ্যতা। সে যদি প্রকৃতির দাস থাকতো তবে দুনিয়ার বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া বহু জীবের মতই হয়ত তার দশা হতো। কিন্তু মানুষের চেতনাই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে এবং সমাজবিকাশের এতগুলি ধাপ পার করে এনেছে। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন থেকে মানুষ এসেছে দাসব্যবস্থায়। তারপর এসেছে সামন্তী যুগ; তাকে অতিক্রম করে এসেছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। আবার বিশ্বজোড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে কয়েকটি দেশে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, অধুনা বিপর্যয় সত্ত্বেও তার অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। বিশ্বের বুকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য-সংস্কৃতির অগ্রাভিযান এই পথ বেয়েই। মানুষ যদি প্রকৃতির অন্ধ অনুসারীমাত্র থেকে যেত, তবে আজকের মানুষকে আমরা পেতাম কি? পেতাম না। মানুষ থাকতো আদিম মানুষের যুগে। হয়তো বা বিলুপ্ত হয়ে যেত পৃথিবী থেকে; কিংবা বাঘ ও কুমীরদের প্রজাতিগুলিকে যেমন ব্যাঘ্রপ্রকল্প, কুমীরপ্রকল্প করে কোনক্রমে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে, তেমনভাবেই মানবপ্রজাতিকে বাঁচাতে মানবপ্রকল্প করতে হত; অবশ্য মানুষ ও তার মস্তিষ্ক না থাকলে ঐ প্রকল্প করতেই বা কে!

প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের পথেই মানুষ মানুষ হয়েছে

মানুষের মানুষ হওয়ার নিয়ামকই হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব এবং তাকে কেন্দ্র করে নিজস্ব সংগ্রাম। মনে রাখতে হবে, এই দ্বন্দ্ব মানে বিরোধ নয়। ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যায়, সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হওয়ার আগেও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব ছিল, কিন্তু সমাজ শোষক ও শোষিত— এই দুই পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার পর থেকে শোষকশ্রেণীর স্বার্থেই এই দ্বন্দ্বে একটি নতুন বিরোধাত্মক এলিমেন্ট বা উপাদান এসেছে। পুঁজিবাদী সমাজে তা আজ চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে এবং মানবজাতি ও সভ্যতাকে অস্তিত্বের সঙ্কটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব, অগ্রগতি সম্ভব একমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের যথার্থ উপলব্ধির ভিত্তিতে প্রকৃতিকে ব্যবহার করার মধ্যে, যেটা একে অপরকে ধ্বংস করার মতো বিরোধ নয়। সেই পথে মানুষ প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, প্রকৃতির সঙ্গে একীভূত, প্রকৃতিরই অংশ।

মহান এঙ্গেল্‌সের হুঁশিয়ারি

পরিবেশ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা এবং বিশেষ করে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর যে সমস্যার মুখে মানবসমাজ আজ দাঁড়িয়ে, ১৯৫০ সালের আগে যা অফিসিয়ালি স্বীকৃতও হয়নি, মার্কসবাদী দৃষ্টিতে তার স্বরূপটি ধরা পড়েছিল বহু বহু আগেই — ১৮৭৬ সালে। সেদিন মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ফ্রেডরিক এঙ্গেলস দেখিয়েছিলেন ঃ ''প্রকৃতির ওপর আমাদের মানুষের বিজয়ের বিষয়টি নিয়ে নিজেদের পিঠ খুব বেশি না চাপড়ানোই ভাল। কারণ, প্রতিটি এই ধরনের বিজয়ে প্রকৃতি তার বদলা নেয়। এটা সত্য যে, প্রতিটি বিজয়ই প্রথম ধাপে আমাদের আশানুরূপ ফল এনে দেয়, কিন্তু এর পরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপে বিষয়টি সম্পূর্ণ বদলে যায়, আগে বোঝা যায়নি এমন সব ঘটনা ঘটতে থাকে— যা আমাদের প্রথমে প্রাপ্ত সুবিধাকে নস্যাৎ করে দেয়।...প্রতিটি ধাপেই আমাদের মনে রাখতে হয়, বিদেশি জনসাধারণের ওপর বিজয়ী দখলদার যেমন করে শাসন চালায়, তেমনভাবে কোনমতেই আমরা প্রকৃতির ওপর শাসন করছি না, প্রকৃতির বাইরে দাঁড়িয়ে একজন যেমনটি করে থাকে। বাস্তবে আমরা আমাদের রক্ত, মাংস ও মস্তিষ্ক নিয়ে প্রকৃতিরই অংশ, এবং প্রকৃতির মধ্যেই অবস্থান করি। অন্য সমস্ত জীবের থেকে আমাদের সুবিধা হচ্ছে, আমরা প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ নিয়মগুলো বুঝতে ও সেগুলো ঠিক-ঠিক মত প্রয়োগ করতে পারি; প্রকৃতির ওপর আমাদের সমস্ত প্রকার নিয়ন্ত্রণ (mastery) এই ঘটনার ওপরই দাঁড়িয়ে আছে....

''উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের ক্রিয়াকলাপের অনেক অনেক কাল পরে কী প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া ঘটবে— তার হিসেব-নিকেশ কীভাবে করতে হবে, হাজার হাজার বছরের শ্রমের ফলে তার কিছুটা আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু, এর সামাজিক

চারের পাতায় দেখুন

গ্লোবাল ওয়ার্মিং

সুন্দরবন সহ পৃথিবীর বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা

তিনের পাতার পর

প্রতিক্রিয়া কী হবে— তা উপলব্ধি আরও অনেক কঠিন...

"এ পর্যন্ত উৎপাদনের প্রচলিত লক্ষ্য হচ্ছে, শ্রমের অত্যন্ত আশু এবং প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক ফল অর্জন করা। কিন্তু এর যে পার্শ্বপ্রতিফল পরে দেখা দেয় এবং বারে বারে করার মধ্য দিয়ে যা প্রকট হয়ে ওঠে, তা সম্পূর্ণ অবহেলিতই থেকে যায়।... যখন পুঁজিপতিরা উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে তখন তাদের হিসেবে প্রথমেই থাকে আশু মুনাফার লক্ষ্য, একেবারে ঠিক সেই মুহূর্তের মুনাফার লক্ষ্য। যখন কোন উৎপাদনকারী বা ব্যবসায়ী একটা উৎপাদন বা ক্রয় করা পণ্য বিক্রি করে তখন সে তার স্বাভাবিক লোভনীয় মুনাফাতেই সন্তুষ্ট থাকে; সেই উৎপাদন বা পণ্য বিক্রির পরে কী প্রতিক্রিয়া ঘটবে তা নিয়ে তার নিজের কোন উদ্বেগ থাকে না। সেই কাজের প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও একই রকম নিরুদ্বিগ্ন থাকে।... প্রকৃতির সঙ্গে এবং সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে বর্তমানে উৎপাদনের উদ্দেশ্য আশু এবং একেবারে হাতেগরম ফলের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।" (Part Played By Labour In Transition From Ape To Man)

এঙ্গেলসের এই ব্যাখ্যা থেকেই বোঝা যায়, ইতিহাসের আগের স্তরগুলির তুলনায় পুঁজিবাদের স্তরে কেন পরিবেশ-ধ্বংস এত সর্বব্যাপক, কেন এমন সর্বগ্রাসী ও অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

উষ্ণায়ন প্রতিরোধে বিজ্ঞানীদের পরামর্শ

সমাজ বা মানুষের প্রয়োজনে শক্তি উৎপাদনের জন্য কয়লা ও খনিজ তেলের জ্বালানি ব্যবহার করতেই হবে, এখনও পর্যন্ত অন্য কোন বিকল্প নেই। অথচ এই সব জ্বালানি ব্যবহারে অবধারিতভাবে গ্রিনহাউস গ্যাস সৃষ্টি হচ্ছে এবং বায়ুস্তরে তার সঞ্চয় ঘটছে। একই মুদ্রার দুটো পিঠ।

তাহলে এখন কী করার আছে? বিজ্ঞানীরা বলছেন— প্রথমত, গ্রিনহাউস গ্যাস রোধে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা দরকার এবং সেই প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে গবেষণা চালানো দরকার। দ্বিতীয়ত, এই দূষণ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গেই, ইতিমধ্যে জমে যাওয়া গ্রিনহাউস গ্যাসের স্তরকে কেমন করে লঘু করে দেওয়া যায়, তার জন্য 'ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট'ও জোরদার করতে হবে। অর্থাৎ একদিকে মনুষ্যসৃষ্ট কার্বন ডাই অক্সাইডকে তার মূল উৎসগুলিতেই — যেমন থার্মাল পাওয়ার স্টেশন, পরিবহন যান ইত্যাদিতেই শোষিত করে নেওয়া, বনাঞ্চল সৃজন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে এবং বিদ্যুতের যথোপযুক্ত ব্যবহার, শক্তি সংরক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তৃতীয়ত, ওজন গ্যাসের স্তর ধ্বংসকারী যে সর্বনাশা ক্লোরো-ফ্লুরো-কার্বন যৌগ ফ্রিজ, এয়ারকণ্ডিশনার ইত্যাদি থেকে ভয়ঙ্করভাবে নির্গত হচ্ছে তার প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। চতুর্থত, কয়লা ও খনিজ তেল পোড়ানোটা যথাসম্ভব কমিয়ে আনা দরকার। পরিবর্তে সৌরশক্তি ও অন্যান্য বিকল্প শক্তির সন্ধানে ও ব্যবহারে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কারণ, খনিজ তেল এবং কয়লাও ফুরিয়ে আসছে।

কে মানবে এই পরামর্শ

কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? কে এগুলি কার্যকর করবে? বিশ্বের বায়ুমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস যারা ঢেলে দিচ্ছে, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই কাজ করতে অস্বীকার করেছে। 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফাণ্ড ফর নেচার'-এর পক্ষে অ্যানড্রু কার দেখিয়েছেন ঃ "গত দশকে আবহমণ্ডলে কার্বনডাই অক্সাইডের যে পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটেছে, তার প্রায় অর্ধেক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারণেই। এই বৃদ্ধি চীন, ভারত, আফ্রিকা ও সমগ্র লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মোট বৃদ্ধির চেয়েও বেশি।"

আমেরিকার ভূমিকা

২০০১-এ জাপানে অনুষ্ঠিত কিয়োটো সম্মেলনে গৃহীত এ সংক্রান্ত চুক্তিপত্রে তারা সেদিনও স্বাক্ষর করেনি, আজও করতে রাজী নয়। অজুহাত, আমেরিকার অর্থনীতি নাকি তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা এই যুক্তিও তোলে যে, শিল্পোন্নত দেশগুলি বেশি এনার্জি বা পেট্রোলিয়াম-কয়লা ইত্যাদি পোড়ানোর ফলে গ্রিনহাউস গ্যাসের এই বৃদ্ধি ঘটছে— এমনটা নয়। তারা অভিযোগ করেছে, অনুন্নত দেশগুলিতে যারা শস্য উৎপাদনের জন্য কৃষিজমি বেশি ব্যবহার করে সেখান থেকেই মিথেন নামে বিশেষ একটি গ্রিনহাউস গ্যাস আবহমণ্ডলে সঞ্চিত হচ্ছে এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে।

এটা যে ডাহা মিথ্যাচার— তা বিশ্বের বিজ্ঞানীরাই জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন, আমেরিকা ও শিল্পোন্নত দেশগুলি যে পরিমাণ কার্বনডাই অক্সাইড সহ গ্রিনহাউস গ্যাস সৃষ্টি করছে, তার তুলনায় অনুন্নত দেশগুলির সৃষ্ট মিথেন গ্যাসের পরিমাণ অতি সামান্য এবং আবহমণ্ডলকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা তার তেমন নেই। উপরন্তু তাঁরা বলেছেন, শিল্পোন্নত দেশগুলি তাদের কৃষিতে ও কৃষি-ফার্মিং-এ ব্যাপক সার ও কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার করছে এবং তাতে যে পরিমাণ মিথেন গ্যাস সৃষ্টি হচ্ছে তা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির থেকে অনেক অনেক বেশি। শুধু তাই নয়, উন্নত জীবনযাত্রার নামে তারা যেভাবে যথেচ্ছ ফ্রিজ, এয়ারকণ্ডিশনার ইত্যাদি ব্যবহার করছে এবং তা থেকে যে ব্যাপকহারে ক্লোরো-ফ্লুরো-কার্বন তৈরি হচ্ছে, তা বাতাসে বিক্রিয়া ঘটিয়ে মিথেন গ্যাস সৃষ্টি করছে। ফলে, প্রকৃতিকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে শিল্পোন্নত দেশগুলিই প্রধানত দায়ী। মার্কিন কর্তারা এটা জানেন না— এমনটা মোটেই নয়। আসলে, শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে তাদের শিল্প থেকে নির্গত গ্রিনহাউস গ্যাস রোধে যে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন এবং সে কারণে যে বাড়তি ব্যয়ভারের দায়িত্ব তাদের ওপর এসে পড়ে— সেটা করতে তারা সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক।

মার্কিন কর্তারা বলেছে, অনুন্নত দেশগুলি আর যাতে নিজেদের বনাঞ্চলগুলি কাটতে না পারে— সেই মর্মে আন্তর্জাতিক আইন তৈরি করা হোক। অর্থাৎ বিষয়টা দাঁড়ালো এই যে, শিল্পোন্নত দেশগুলি নিজেদের প্রয়োজনে আপন আপন বনাঞ্চল কেটে বহু পূর্বেই সাফ করে দিয়েছে, এমনকী অনুন্নত দেশগুলি দখল করে তার প্রাকৃতিক সম্পদকেও লুঠ করে নিয়ে নিজেদের পকেট ভরিয়েছে। তারাই বাস্তবে বিশ্ববাসীর বিপদ ডেকে এনেছে। আজ আইন করে দুনিয়াকে রক্ষা করার ধুয়া তুলে সমূহ দায় তারা অনুন্নত দেশগুলির ওপর চাপাতে চাইছে।

অস্ট্রেলিয়ার বক্তব্য

গ্রিনহাউস গ্যাস সৃষ্টিতে দ্বিতীয় স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়াও এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেছে। তাদের বক্তব্য, বিপজ্জনক গ্রিনহাউস গ্যাস সৃষ্টির মূল কারিগর আমেরিকা ও চীন আগে সতর্ক হোক।

ভারত সরকারের বক্তব্য

আমাদের ভারত সরকারের পরিবেশ মন্ত্রকের বক্তব্য, প্যারিস রিপোর্টের সব ক'টি দিক সরকার আগে খতিয়ে দেখতে চায়। আর, গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর বিষয়ে এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন। তার পরে সরকার বিবেচনা করে দেখবে, এ সংক্রান্ত বিশেষ নীতি এই মুহূর্তে এ দেশে দরকার আছে কি না।

আমাদের ভারতবর্ষেই দেখতে পাচ্ছি, আকাশ-বাতাস কালো ধোঁয়ায় ঢেকে থাকছে, সরকারি-বেসরকারি প্রায় সমস্ত গাড়ি এবং পুলিশের গাড়িগুলোও বিস্তর কালো ধোঁয়া অনবরত আমাদের মুখের ওপর ঢেলে দিচ্ছে। শিল্প-কারখানাগুলোও বাতাসে সমানে উগরে চলেছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কোন বালাই নেই। এ ব্যাপারে স্পঞ্জ আয়রণ কারখানাগুলো সবার ওপরে। এছাড়াও শহরে শহরে রাস্তার ধারের গাছগুলো নির্বিচারে কেটে ফেলা হচ্ছে, শহরের কাছাকাছি যতটুকু জলা জায়গা ও সবুজ এলাকা ছিল, তাও ভরাট করে মাথা তুলছে হাউসিং কমপ্লেক্স। এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে নেতা-মন্ত্রী, প্রমোটার ও ক্রিমিনালচক্র। সবুজ কৃষিজমি ধ্বংস করে রাজ্যে রাজ্যে অধিষ্ঠিত ডান-বাম নির্বিশেষে প্রতিটি সরকারই মালিক-পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিতে চাইছে লক্ষ লক্ষ একর কৃষিজমি, নগরায়ন ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়বার জন্য। সবুজ ধ্বংস করা হচ্ছে, বাতাসে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সহ যাবতীয় গ্রিনহাউস গ্যাস। কারেন্ট সায়েন্স'-এ গত বছর কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক প্রকাশিত একটি পেপারে দেখানো হয়েছে, ২০২০ সাল নাগাদ ভারতবর্ষ আবহমন্ডলে ঢেলে দেবে ৩০০ কোটি টন গ্রিনহাউস গ্যাস, যা ২০০০ সালের দ্বিগুণ। অবশ্য ঐ সময় সমগ্র দুনিয়া যে পরিমাণ গ্যাস উদ্‌গীরণ করবে, ভারতের পরিমাণটি তার ৫ শতাংশেরও কম, কিন্তু তা বলে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

গরিব মানুষের ওপর পড়বে উষ্ণায়নের ভয়ঙ্কর প্রভাব

সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক তথ্যই দেখাচ্ছে, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির বিপন্নতায় এশিয়া ও আফ্রিকার গরিব জাতিগুলিই সবচেয়ে বেশি ভুগবে। বিশ্ব-উষ্ণায়ন গরিব দেশগুলিতে আরও অনাহার সৃষ্টি করবে। এমন ২৭টি দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম। ভারতের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ বাস করে সমুদ্রের বর্তমান তটরেখা থেকে ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে। মুম্বাই, চেন্নাইয়ের মত মেগাসিটি, কলকাতা সহ ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা, তার বিরাট জনসমষ্টি ও পরিকাঠামো, উর্বর কৃষিজমি—সবটাই পড়ছে এই বলয়ের মধ্যে। সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি ঘটলে লবণাক্ত জল ঢুকে পড়বে এলাকায়, পানীয় জলের ভান্ডার বিপন্ন হবে, চাষের জল নষ্ট হয়ে যাবে। প্রতি বছর যে ২৯০০ কোটি টন কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ঢালা হচ্ছে, তাতে সমুদ্রের জল ভীষণভাবে 'অ্যাসিডিক' হয়ে উঠেছে। তার ফলে, খাদ্য উৎপাদন ও সকলের খাদ্য পাওয়ার গ্যারান্টি, পরিশ্রুত পানীয় জলের সরবরাহ, অরণ্যের জৈব-বৈচিত্র্য, উপকূলীয় ব্যবস্থা, মাছধরা এবং অন্যান্য বিষয়গুলি মারাত্মকভাবে বিপন্ন হবে। চাষী, অরণ্যবাসী, মৎস্যজীবী ও গরিব মানুষের ওপর পড়বে এর বিষময় প্রভাব। লেহ্‌মান ব্রাদার্স-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভারতবর্ষ। ভারতের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ৫ শতাংশ মার খাবে। এই ক্ষতির পরিমাণ ইউরোপের দেশগুলির ক্ষতির দ্বিগুণ এবং আফ্রিকার থেকেও ১ শতাংশ বেশি (সূত্র ঃ ফ্রন্টলাইন, ৯ মার্চ ২০০৭)।

ইতিমধ্যেই ভারতের গরিব মানুষ পানীয় জলের তীব্র সঙ্কটে, জলদূষণে, পশুখাদ্য ও জ্বালানি কাঠের অভাবে, ভূমিক্ষয়ে, মরু এলাকা বৃদ্ধিতে, খরা ও বন্যায় ভুগছে। পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ দিকে এগুচ্ছে।

ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের বক্তব্য

ইতালি, নেদারল্যান্ডস্, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলিতে ইতিমধ্যেই উষ্ণতা বৃদ্ধি ঘটেছে মারাত্মকভাবে। শস্য উৎপাদনে, মানুষের জীবনে পড়েছে তার প্রভাব।

ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ঘোষণা করেছে, তারা ২০২০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ৩০ শতাংশ কমিয়ে ফেলবে, অবশ্য যদি অন্য রাষ্ট্র বিশেষত আমেরিকা এবং চীন, মেক্সিকো, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকার মত সম্ভাব্য বৃহৎ উন্নয়নশীল রাষ্ট্র তাদের এই প্রচেষ্টায় সামিল হয়। অর্থাৎ রাধাও নাচবে না, আর সাত মণ ঘিও পুড়বে না।

বাস্তবে, কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই এসব নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে না। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের ও জনসাধারণের থেকে ওঠা দূষণ নিয়ন্ত্রণের জরুরি দাবিকেও নানা অছিলায় নস্যাৎ করা হচ্ছে। কিন্তু কেন? দুনিয়ার রাষ্ট্রনায়কেরা ও শাসকেরা আগত সর্বনাশ চোখের সামনে দেখেও দেখতে চাইছেন না কেন?

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি উষ্ণায়ন রোধে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণে নারাজ কেন

এর কারণ হচ্ছে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি ও তাদের ক্ষমতাসীন সরকারগুলির লক্ষ্য জনগণের স্বার্থরক্ষা নয়; তাদের লক্ষ্য— পুঁজিপতি-মালিকশ্রেণীর মুনাফার স্বার্থরক্ষা করা, তাদের পুঁজির লুণ্ঠনগতিকে আরও অবাধ ও লাগামছাড়া করে তোলা। পুঁজির ধর্মই হচ্ছে সর্বোচ্চ মুনাফার লক্ষ্যে ছুটে চলা; এ না হলে পুঁজিবাদের মৃত্যু। পুঁজির মালিকরাও তাই যেভাবে হোক সর্বোচ্চ মুনাফার লালসায় ছুটছে। তাতে প্রকৃতি ধ্বংস হোক, মানুষ মরুক, সভ্যতা রসাতলে যাক— তাতে তাদের কিছুই যায় আসে না। ১৮৪৮ সালেই মার্কস ও এঙ্গেলস পুঁজির এই নির্লজ্জ লুণ্ঠন চরিত্র তুলে ধরে 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো'তে লিখেছিলেন, "মানুষের ব্যক্তিমূল্যকে এরা পরিণত করেছে বিনিময় মূল্যে; অগণিত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থানে এরা এনে খাড়া করলো ঐ একটিমাত্র স্বাধীনতা— অবাধ বাণিজ্য, যাতে বিবেকের স্থান নেই।"

পুঁজিবাদ নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রকৃতিকে ধ্বংস করে চলেছে

এখন তো পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ এবেলা-ওবেলার সঙ্কটে আবর্তিত হচ্ছে; সর্বব্যাপক সঙ্কটে ডুবছে। সঙ্কট থেকে বাঁচতে বিশ্বজুড়ে লুণ্ঠনের নয়া লক্ষ্যে পুঁজিবাদ 'বিশ্বায়ন'-এরও আমদানি করেছে। তাতেও তীব্র বাজার সঙ্কট থেকে রেহাই নেই। অর্থাৎ মালিকশ্রেণীর উৎপাদিত পণ্য কেনার মত আর্থিক ক্ষমতা অধিকাংশ মানুষের নেই; পণ্য জমে যাচ্ছে গোডাউনে। লক্ষ লক্ষ কারখানায় লালবাতি জ্বলছে, কোটি কোটি শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গেছে। বেসিক ইণ্ডাস্ট্রি বা বুনিয়াদি শিল্পে তাই মুনাফা হচ্ছে না। পুঁজি অলস হয়ে পড়েছে। তাই বিশ্বজুড়ে পুঁজিপতিশ্রেণী তাদের পুঁজি ঢালতে ছুটছে শেয়ার বাজারে, ফাটকা ব্যবসায়, পর্যটনে, আবাসন তৈরিতে এবং গাড়ি-টিভি-প্রসাধনী সামগ্রী সহ 'কনজিউমার গুড্‌স' নির্মাণে। পর্যটন ও আবাসন করতে গিয়ে পুঁজিপতিরা আবার প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে, জ্বালানি তেল পুড়িয়ে গ্রিনহাউস গ্যাস প্রকৃতিতে ঢেলে দিচ্ছে। পাশাপাশি, তারা তীব্র বাজার সঙ্কটে পড়ে নিজেদের পণ্য বিক্রির কৃত্রিম বাজার তৈরি করতে নানাভাবে প্রচার চালিয়ে

সাতের পাতায় দেখুন

নন্দীগ্রাম গণহত্যার প্রতিবাদে

অপরাধীদের বিচার ও শাস্তির দাবিতে মেদিনীপুর সুরক্ষা সমিতির নাগরিক সম্মেলন

১১ এপ্রিল মেদিনীপুর সুরক্ষা সমিতির উদ্যোগে মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর হলে অনুষ্ঠিত হ'ল নন্দীগ্রাম গণহত্যার অপরাধীদের বিচার ও শাস্তির দাবিতে নাগরিক সম্মেলন। কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, সাংবাদিক বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, শিক্ষা আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তপন রায়চৌধুরী ও অনুরাধা মহাপাত্র। এছাড়াও ছিলেন নন্দীগ্রামের ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা নন্দ পাত্র ও খড়্গপুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির সম্পাদক বিবেকানন্দ সাহু। উপস্থিত ছিলেন প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ। শহীদ বেদিতে মাল্যদান ও জমি আন্দোলনে নিহত শহীদদের স্মৃতিতে ২ মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু করেন সভাপতি আশিস কিশোর চ্যাটার্জী। সংক্ষিপ্ত ভাষণে সমিতির সম্পাদক তীর্থঙ্কর ব্যানার্জী বলেন, শুধুমাত্র দায় স্বীকার করে নন্দীগ্রামের গণহত্যার শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। প্রধান বক্তা তরুণ সান্যাল এই গণহত্যার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। নন্দীগ্রামের মানুষের অটুট সংগ্রামী মনোবলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, তপন রায়চৌধুরী, নন্দ পাত্র এবং বিবেকানন্দ সাহু। নন্দ পাত্র যখন বক্তব্য রাখতে ওঠেন, সমবেত সকলেই করতালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। দু'বছর আগে যখন নন্দীগ্রামকে হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের অন্তর্ভুক্ত করার চক্রান্ত হয় তখন থেকেই কীভাবে নন্দীগ্রামের মানুষ গণকমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে একটু একটু করে শক্তি সঞ্চয় করে আজ প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তুলেছে তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে নন্দ পাত্র বলেন, সঠিক মতাদর্শকে বেছে নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলাই বর্তমান সময়ের আশু কাজ। আশিস কিশোর চ্যাটার্জীর সংক্ষিপ্ত ভাষণের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়। সভার শেষে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঘটনার উপর নির্মিত একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

খড়্গপুরে বুদ্ধিজীবীদের কনভেনশন

নন্দীগ্রাম গণহত্যা এবং জমিরক্ষার আন্দোলনের সমর্থনে খড়্গপুরে ১৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হ'ল শিল্পী, সাংস্কৃতিককর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের এক বিশাল কনভেনশন। আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের প্রাক্তন সদস্যা অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা সুজাত ভদ্র, গণতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগঠক অমিতাভ চ্যাটার্জী, লিটল ম্যাগাজিন সংগঠনের প্রেমাংশু দাশগুপ্ত প্রমুখ 'সারা বাংলা শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চে'র বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা। লেখক অশোক মুখার্জী ও শিক্ষিকা সুমনা ভদ্রের গাওয়া উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে কনভেনশনের কাজ শুরু হয়। শোক প্রস্তাবের বদলে জয় গোস্বামীর সমসাময়িক একটি কবিতা পাঠ করেন সাংবাদিক মৃণাল শতপথি। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন শিক্ষক সত্যজিত ঘোষ। প্রস্তাবের সমর্থনে সংগঠকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক বিজয় পালিত, নির্মল সরকার প্রমুখ। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন খড়্গপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখেন, আই আই টি-র অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী। কনভেনশনের শেষ পর্বে খড়্গপুর শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী- বুদ্ধিজীবী মঞ্চের একটি স্থায়ী কমিটি গঠনের প্রস্তাব আনেন অধ্যাপক অরূপ দাশগুপ্ত। অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি, শিক্ষক বিজয় পালিত ও সত্যজিত ঘোষকে যুগ্ম সম্পাদক এবং মণিশঙ্কর পট্টনায়ককে কোষাধ্যক্ষ করে সর্বসম্মতিক্রমে একটি কমিটি গঠিত হয়। খড়্গপুরে কৃষিজমি দখলের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিরাও কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন।

আসানসোলে বুদ্ধিজীবীদের কনভেনশন

১১ এপ্রিল আসানসোল বার অ্যাসোসিয়েশন হলে স্থানীয় বিশিষ্টজনের উদ্যোগে নন্দীগ্রাম গণহত্যার প্রতিবাদে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট আইনজীবী অসিত নায়েক। প্রধান বক্তা ও শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য চন্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, পশ্চিমবাংলার অসংখ্য বন্ধ কারখানা খোলার কোনও উদ্যোগ না নিয়ে শিল্পায়নের নামে ভাঁওতা দিয়ে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে হাজার হাজার একর উর্বর কৃষিজমি অধিগ্রহণ করছে সরকার। এর বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের প্রতিবাদ করা দরকার। নন্দীগ্রামে ১৪ মার্চ পুলিশ ও সিপিএমের গুণ্ডাবাহিনী যে নারকীয় তাণ্ডব চালিয়েছে তিনি তার তীব্র নিন্দা করেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা সুচেতা কুণ্ডু, বিশিষ্ট কবি ও শিক্ষক কুমুদ মণ্ডল, ডাঃ স্বাতী ঘোষ, আইনজীবী অসীম ঘটক, শ্যামল মুখার্জী প্রমুখ। কনভেনশন থেকে অসিত নায়েককে সভাপতি, অসীম ঘটককে কার্যকরী সভাপতি, কুমুদ মণ্ডল ও সঞ্জয় চ্যাটার্জীকে যুগ্ম সম্পাদক এবং দেবদাস মাঝিকে কোষাধ্যক্ষ করে শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের আসানসোল আঞ্চলিক শাখা গঠিত হয়।

বাওয়ালিতে বুদ্ধিজীবীদের সভা

নন্দীগ্রাম গণহত্যার প্রতিবাদে ৮ এপ্রিল সাতগাছিয়া-বাওয়ালি অঞ্চলের বিশিষ্ট মানুষের উপস্থিতিতে বাওয়ালি মহেশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন এলাকার প্রবীণ শিক্ষক মহেন্দ্রলাল মণ্ডল। দৃষ্টিহীন শিল্পী সমর চক্রবর্তীর স্বরচিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন সভার অন্যতম আহ্বায়ক বাসুদেব কাবড়ি। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, ডাক্তার তরুণ রায়, শিক্ষক অমিয় দাস, কবি বৃন্দাবন দাস, এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ রায়, সমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও স্বপন রায়। নাট্যকর্মী ও কবি শিক্ষক জওহরলাল চক্রবর্তী কবিতা পাঠ করেন। সবশেষে বক্তব্য পেশ করেন শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের প্রতিনিধি চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। সভা পরিচালনা করেন নাট্যকর্মী কাঞ্চন মণ্ডল। সভাশেষে একটি কমিটি গঠিত হয়।

রামপুরহাটে প্রতিবাদ সভা

নন্দীগ্রাম গণহত্যার প্রতিবাদে গত ৬ এপ্রিল রামপুরহাটে নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক, শিক্ষক, আইনজীবী, কবি, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মী সহ সর্বস্তরের মানুষের আহ্বানে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক দেবকুমার চ্যাটার্জী। গণহত্যায় নিহতদের প্রতি শোকজ্ঞাপনের পর শিল্পী জহর গাঙ্গুলী কৃষক আন্দোলনের উপর তাঁর রচিত ও সুরারোপিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করেন শিক্ষক গুণাধীশ দাস। সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মুকুল রায়, শিক্ষিকা পম্পা দাস, বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তী, আইনজীবী আব্দুল হাসিব, সমাজসেবী নজরুল ইসলাম, শেখর সিন্‌হা, মদন ঘটক প্রমুখ। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের জেলা সহসভাপতি অধ্যাপক কবি অমিত চক্রবর্তী, মিত্রভূম উচ্চতর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বরুণ কর্মকার এবং লোহারাম দে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

আগামী দিনে এই ধরনের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করতে ও গণচেতনা গড়ে তুলতে একটি স্থায়ী কমিটি গড়ে তোলার প্রস্তাব উত্থাপন করেন আইনজীবী মুরারি সাহা, সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক আতাহার রহমান। তিনি বলেন, আগামী দিনে এই উদ্দেশ্যে একটি সভা আহ্বান করা হবে এবং কলকাতায় শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের শাখা হিসাবে এই কমিটি কাজ করবে। সভা শেষে নন্দীগ্রামের অত্যাচারিত মানুষের জন্য অর্থসংগ্রহের কর্মসূচিও গৃহীত হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষাকর্মীরা যৌথ প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত রাখলেন

দেড়শো বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষাকর্মীরা নন্দীগ্রাম গণহত্যা ও শিল্পায়নের ভাঁওতা দিয়ে কৃষিজমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে ১৭ এপ্রিল সন্ধ্যা ছটায় মহাবোধি সোসাইটি হলে এক যৌথ কনভেনশনে মিলিত হন। ৩০ বছরের সিপিএম-ফ্রন্ট শাসনে শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষাকর্মীদের দলমত নির্বিশেষে শাসকদলের কোন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এভাবে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদে সামিল হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল।

এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি অধ্যাপক কবি তরুণ সান্যাল। সূচনায় সভার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষাকর্মী যুক্তমঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক শুভেন্দু মুখার্জী। বক্তব্য রাখেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, অধ্যাপক কুণাল সেন, হায়ার এডুকেশন কাউন্সিলের সদস্য সচিব অধ্যাপক নির্মাল্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক কবি তরুণ সান্যাল এবং অধ্যাপক তরুণ নস্কর। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন শিক্ষাকর্মী দীপক চক্রবর্তী, সমীর ব্যানার্জী এবং ছাত্র অভিষেক সরকার; উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডেপুটি রেজিস্ট্রার অধ্যাপক দিলীপ মুখোপাধ্যায়, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সম্পাদক অনিল সরকার, অধ্যাপক মিহির চক্রবর্তী, অধ্যাপক নবীনানন্দ সেন, অধ্যাপক অরিন্দম ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক কৌশিক গাঙ্গুলি।

এই কনভেনশন থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষাকর্মী যুক্ত মঞ্চ শিল্পায়নের ভাঁওতা দিয়ে কৃষিজমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদী আন্দোলনকে আরও সুসংগঠিত ও বিস্তৃত করার কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

নন্দীগ্রামের আক্রান্ত মানুষদের জন্য মুক্তহস্তে সাহায্য করুন

এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে নন্দীগ্রামের অত্যাচারিত মানুষদের সাহায্যার্থে রাজ্যের সর্বত্র ত্রাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। সমাজের সর্বস্তরের সংবেদনশীল ও মানবিক বোধসম্পন্ন নাগরিকদের কাছে এই ত্রাণ তহবিলে মুক্তহস্তে দান করার জন্য আবেদন জানানো হচ্ছে। অর্থসাহায্য নগদে, চেকে বা ড্রাফটে করতে পারেন। চেক/ড্রাফট এই নামে দিতে হবেঃ

Nandigram Relief Fund Socialist Unity Centre of India

অর্থ পাঠাবার ঠিকানাঃ **Socialist Unity Centre of India,**
48 Lenin Sarani, Kolkata-700013.

১৯টি আসনে জয়ী এ আই ডি এস ও

একের পাতার পর

আই ডি এস ও প্রার্থীরা ৭টি আসনে জয়লাভ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে যদি নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় থাকত, বিরোধীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অবাধ সুযোগ থাকত, তাহলে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে এস এফ আই-এর সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চিত ছিল। শুধু তাই নয়, ১৯টি আসনে এ আই ডি এস ও প্রার্থীদের এই জয় এটাও প্রমাণ করে যে, এস এফ আই-এর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছাত্রসংসদ দখল ছাত্রদের রায় নয়।

এ আই ডি এস ও রাজ্য সম্পাদক নভেন্দু পাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এস এফ আই-এর ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে এ আই ডি এস ও প্রার্থীদের সর্বাধিক ভোটে জেতানোর জন্য ছাত্রছাত্রীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এই জয় প্রমাণ করল, সিঙ্গুরের কৃষকদের উপর নারকীয় অত্যাচার এবং নন্দীগ্রামের গণহত্যার প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা সরব। তিনি এই জয়ের অনুপ্রেরণা নিয়ে শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি, ডোনেশন-ক্যাপিটেশন ফি, বেসরকারীকরণ সহ শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বিক আক্রমণের বিরুদ্ধে একমাত্র বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

১৪ এপ্রিল খড়্গপুরে কনভেনশনে বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার,

বাঁশবেড়িয়া গ্যাঞ্জেস জুট মিল

দলীয় এবং পুলিশি সন্ত্রাস চালিয়ে শ্রমিক ঐক্য ভাঙা যাবে না

একের পাতার পর

রাখতে তাঁরা মরিয়া। পরিবারগুলিও তা জানে। তাই পরিবারের উপার্জনকারী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তাদের নেই; শুধু মালিক ও দালাল শ্রমিক সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে তাদের বুকভরা ঘৃণা উপচে পড়ছে।

সেদিন দুই ও পাঁচ বছরের দুই নাতনির হাত ধরে এক শ্রমিক পরিবারের মা এসেছিলেন শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস — ঝুলানিয়া সংগ্রামী ক্যাম্পে। 'ফ্যানটা কোথায় রেখেছো বাবা, দাও না আমাকে। দু-দিন খাওয়া জোটেনি।'

গত ৬ মাস ধরে আন্দোলনরত শ্রমিকরা দুপুরে যৌথ রান্নার ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছেন ওঁদের ঝুলানিয়া সংগ্রামী ক্যাম্পে। হাটে-বাজারে, চালু কারখানার গেটে, গ্রামে-শহরে ঘুরে তাদের স্বেচ্ছাসেবকরা চাল-ডাল-টাকা সংগ্রহ করে আনে। শ্রমিকদের সবার খাওয়া তখনও হয়নি, কয়েকজন বাকি। বলেন, 'এসো মা, যা আছে, সবাই ভাগ করে খাই।' ভাত-ডাল-আলুচোখা দিয়ে সবার সঙ্গে খেলেন ঐ মা ও দুই নাতনি। তারপর শ্রমিকরা নিজেদের সংগ্রহ করা চালের থেকে ২ কেজি তুলে দিলেন মায়ের হাতে।

কর্মহীন অবস্থায় শ্রমিক পরিবারগুলির কেমন করে চলছে? তা সরেজমিনে দেখার জন্য গণদাবী'র প্রতিনিধি গিয়েছিলেন শ্রমিকদের বস্তিতে। সাউ বস্তিতে থাকেন সুশীলা দেবী (৪৩)। শ্রমিক মহল্লায় সকলের তিনি চাচী। হাসি মুখ। কিন্তু শ্রমিকরা যখন পুলিশের দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন এই চাচী এসে দাঁড়ান সকলের সামনে পুলিশের মুখোমুখি, কোমরে হাত দিয়ে। বুক দিয়ে আগলে তিনি রক্ষা করেন শ্রমিকদের। তখন তাঁর মূর্তি রণং দেহি। ৯ জনের সংসার। দুই ছেলে চটকলের শ্রমিক। এখন তো চটকলের আয় বন্ধ; কেমন করে সংসার চলছে? প্রশ্ন শুনে সুশীলা দেবী বলে উঠলেন, শুধু পেটে খাওয়া তো নয়, দুটো ছেলে-মেয়ের পড়াশুনো আছে। অসুখ হলেই ডাক্তারের ৫০/৬০ টাকা ফি, ২০০ টাকার ওষুধ চাই। দেখে যান, কী কষ্ট করে সংসার চালাতে হচ্ছে! চটকলে কাজ নেই, ছেলেরা পাকাঘর তৈরির জোগাড়ের কাজ করে, ইট ধোয়ার কাজ করে যা ইনকাম করে তাই দিয়ে চলছে। শ্রমিক-ধর্মঘট প্রসঙ্গে বললেন, ধর্মঘট ছাড়া আর কী উপায় আছে বলুন। শ্রমিকদের মজুরির অর্ধেক টাকা কোম্পানি মেরে দিচ্ছে। মজুরি মাত্র ৭৩ টাকা। তাতে বালবাচ্চা, বাপ-মা নিয়ে সংসার চলে! হয় চুরি করতে হবে, নয় তো ট্রেনের চাকায় গলা দিতে হবে। ছেলেরা তা তো করছে না, ন্যায্য পাওনা দিতে বলছে।

সুশীলা দেবীর ছেলে ২৬ বছরের শ্যামবাবু রাজভর বললেন, ৫ বছর আগে ২০০২ সালে শ্রমমন্ত্রী মহম্মদ আমিনের ঘরে বসে মালিক ও ইউনিয়নকে নিয়ে যে চুক্তি হয়েছিল, আমরা সেই মতো পাওনাটুকুই চাইছি। তার বেশি নতুন কোনও দাবি তো করছি না। সেটা আমরা কেন পাবো না? কোম্পানি কেন দেবে না? সরকারই বা চুপ করে আছে কেন? পুলিশ ধমকি দিচ্ছে কেন? গুণ্ডা দিয়ে মারছে কেন?

২৮ বছরের যুবক রামসিংহ তেওয়ারি বললেন, কারখানা বন্ধ। ৫ জনের সংসার চালাতে তাই জোগাড়ের কাজ করি। আমি জোগাড়ের কাজে পাই ১০০ টাকা, কারখানা আমাকে দিত ৭৩ টাকা। কারখানা টিফিন করতে সময় দিত আধঘণ্টা, জোগাড়ের কাজে পাই এক ঘণ্টা। কারখানায় কত খাটুনি! কিন্তু মিনিমাম টাকাটা যদি না পাই, কী করে চলে বলুন তো! তারপর বললেন, কিন্তু জোগাড়ের কাজে নিশ্চয়তা নেই, সেই তুলনায় কারখানার কাজ পার্মানেন্ট। সেটার জন্যই লড়ছি।

এমনিভাবে জোগাড়ের কাজ করে, রিক্সা-ঠ্যালা টেনে, কিংবা ফুচকা বিক্রি করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে কমলেশ সাউ-এর ৬ জনের সংসার, বীরেশ্বর দাসের ৫ জনের সংসার, আফরোজ আলমের ৭ জনের সংসার, মহম্মদ নিয়াজ আলমের ৮ জনের সংসার। কিন্তু তাই বলে কোম্পানি ও দালাল ইউনিয়নগুলোর গুণ্ডারাজের কাছে কেউই মাথা নোয়াতে রাজি নন। কোনও বিক্ষোভ-আন্দোলন, অবস্থান বা ডেপুটেশনের কর্মসূচি থাকলে কাজ ফেলে সবাই এসে হাজির হন ঝুলানিয়া সংগ্রামী ক্যাম্পে। কর্মহীন হয়ে ৬ মাসের অনাহার-অর্ধাহার সত্ত্বেও ২০-২২ বছরের সাগর মণ্ডল, কমলেশ বা চন্দন দাসদের মত তরুণ শ্রমিকরাই শুধু নয়, ৪৩ বছরের মহম্মদ মৌলাদিনও তারুণ্যে টগবগ করছেন। প্রতিরোধ সংগ্রামের আগুন তাদের প্রত্যেকের বুকে কেমন দাউ দাউ করে জ্বলছে — না দেখলে বোঝা যায় না। তাঁরা বলছেন — রিক্সা চালাব, বুট পালিশ করব, তবু মালিকের জুলুম ও বঞ্চনা মেনে নেব না।

৬ মাসব্যাপী অর্ধাহার-অনাহার, ত্রাস, পুলিশ ও গুণ্ডাদের আক্রমণ সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে যে মানসিক শক্তি নিয়ে শ্রমিকরা লড়ে যাচ্ছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। অথচ দুঃখের হলেও সত্য, প্রচারমাধ্যমের আলো তাদের ওপর পড়ে না বললেই চলে, মিডিয়া তাদের দিকে কার্যত ফিরেও তাকায় না। কিন্তু কেন? গরিবের দুঃখের কথাও তো মিডিয়া বাজারে বেচে, তাহলে এদের দিকে তারা চায় না কেন? ওরা গরিব শ্রমিক, বস্তিবাসী হয়েও মাথানত করেনি বলে? টাকাওয়ালাদের বিরুদ্ধে লড়ছে বলে? কোন ভাঙচুর ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা না করে সঙ্কল্পে ও সংগ্রামে অবিচল বলে? সিপিএমের সিটু, কংগ্রেসের ইনটাক, বিজেপি'র এইচ এম এস প্রভৃতি সাতটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের দালালির বিরুদ্ধে ওরা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে বলে? সরকার ও পুলিশ-প্রশাসন মালিকের পক্ষে বলে? এই প্রশ্ন স্থানীয় সাধারণ মানুষের মধ্যেও। ঝুলানিয়া মোড়ে চায়ের দোকানদার দীনেশ পাশোয়ান তাই দুঃখ করে আমাদের প্রতিনিধিকে বললেন, 'কাগজে দয়া করে এদের খবর ছাপবেন। এরা ন্যায্য দাবি নিয়ে লড়ছে। এদের কোন গলতি নেই। এদের ওপর বড্ড অত্যাচার হচ্ছে। একটা প্রতিকার চাই। সব মানুষকে এদের খবর জানানো দরকার।'

দ্য গ্যাঞ্জেস জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির ২নং ইউনিটে কর্মরত কমরেড অযোধ্যালাল মাহাত নিজের ইউনিটে শ্রমিকদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়ছেন। বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তিনি অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক। ১নং ইউনিটের শ্রমিকদের আহ্বানে এগিয়ে এসেছেন, সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করছেন। এখন ইনিই শ্রমিক ধর্মঘটের নেতা। বললেন, 'যখন সব ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের পরিত্যাগ করে মালিকের পক্ষ নিয়েছে তখন আমাদের ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিকরা এককাট্টা হয়ে লড়ছে। ধর্মঘট ভাঙতে মালিক ধর্মঘটী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা- মামলা, ধমকি, চার্জশিট জারি করিয়েছে। শ্রমিক-লাইনে বাড়ি বাড়ি হানা দিচ্ছে পুলিশ ও দালালরা। পুলিশ ২৩ জন শ্রমিকের ওপর দাঙ্গা, খুনের চেষ্টা ইত্যাদি মিথ্যা মামলা চাপিয়েছে।' বললেন, 'গত রবিবার ১৫ এপ্রিল সকাল ১০টা ৪০-এ ধর্মঘটী শ্রমিকদের মিছিলের ওপর তৈয়াব হোসেন, জয়নারায়ণ, জুলফিকার আলি সহ সমাজবিরোধীদের দিয়ে মালিক আক্রমণ করালো। এর পিছনে আছে মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও সিপিএম নেতা কানাই মজুমদার। ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির সদস্য শ্রীকৃষ্ণ পাল এবং শ্রমিক বীরেন্দর দাস, মহম্মদ মুন্না সহ ১০ জন আহত হয়েছেন। বুকে আঘাত নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ পাল গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে, মুখের চোয়াল ভেঙে বীরেন্দর দাস জওহরলাল নেহেরু হাসপাতালে এখন শুয়ে আছেন। বীরেন্দরের অপারেশন করতে হবে।'

এই বর্বর হামলার প্রতিবাদে পরদিন ১৬ এপ্রিল সহস্রাধিক শ্রমিক কালো ব্যাজ পরে ধিক্কার মিছিল বের করে। ২নং মিলের শ্রমিকরা এবং এলাকার সাধারণ মানুষ ধর্মঘটীদের সাহস ও বীরত্বকে প্রশংসা করেছে, নানা প্রকার সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর এই বর্বর হামলার নিন্দা করে শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। ইনটাক-এর কিছু শ্রমিকও তাদের ইউনিয়ন নেতাদের দালালির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সংগঠন ত্যাগ করে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছেন। এদিকে মহল্লায় মহল্লায় শ্রমিকরা তাদের পরিবারের সদস্য ও অন্যান্য মানুষদের নিয়ে কমিটি গঠন করছেন আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী রূপ দেবার জন্য, মালিক ও ইউনিয়নগুলোর দালালদের আনাগোনা রুখবার জন্য। পুলিশ-প্রশাসন কেমন নির্লজ্জভাবে মালিকের পক্ষে কাজ করছে তার বিবরণ দিতে গিয়ে শ্রমিকরা জানালেন, পুলিশের সামনেই গুণ্ডারা শ্রমিকদের পেটালো। অথচ গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে ফাঁড়ির পুলিশ সুমনবাবু জখম শ্রীকৃষ্ণ পালকে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল দিয়ে গ্রেপ্তারের হুমকি দিলে শ্রমিকদের প্রতিরোধের কাছে পিছু হঠতে বাধ্য হন। ঐদিন সন্ধ্যা ৭টায় শ্রমিকরা এই আক্রমণের বিরুদ্ধে থানায় এফ আই আর করতে গেলে ওসি তা নিতে অস্বীকার করেন। যুক্তি হচ্ছে, এফ আই আর লেখা কাগজের মাপটা ঠিকমত হয়নি। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শান্তি ঘোষ ওসি'র কাছে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি পরদিন আসতে বলেন। পরদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চারবারের চেষ্টায় ওসি এফ আই আর গ্রহণ করলেও তার লিখিত প্রাপ্তি স্বীকার করতে এবং এফ আই আর নম্বর দিতে অস্বীকার করেন। তার পরদিন লিখিত প্রাপ্তি স্বীকার করলেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এফ আই আর নম্বরটি দেননি। অথচ ১৯ এপ্রিল শ্রমিকদের মিছিলে হামলা চালিয়ে সিটু নেতারা জুট শ্রমিকদের আন্দোলনের দুই নেতা আযোধ্যালাল মাহাতো এবং বি ভাস্কর রাওয়ের নামে মিথ্যা অভিযোগে এফ আই আর দায়ের করেছে পুলিশের পূর্ণ সহযোগিতাতেই। তাই ধর্মঘটী শ্রমিকরা পুলিশ দেখলেই বলছে — ওরা সিপিএমের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী, ভাড়া করা ক্রিমিনাল।

ছাত্র সংগঠন সারা ভারত ডি এস ও'র হুগলি জেলা শাখার কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে ১৮ এপ্রিল দেখা হ'ল ঝুলানিয়া সংগ্রামী ক্যাম্পে, বেলা ৩টে নাগাদ। তাঁরা সকাল থেকে ত্রিবেণী স্টেশন ও বাজারে অর্থসংগ্রহ করেছেন ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্য করতে, জেলা সম্পাদক কমরেড দীপক সিংহের নেতৃত্বে। তাঁদের প্রত্যেকের বুকে আটকানো ব্যাজে লেখা 'বাঁশবেড়িয়া গ্যাঞ্জেস জুট মিলের আন্দোলনরত শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ান — এ আই ডি এস ও।' শ্রমিকরা ইউনিয়ন অফিসে এই ছাত্রছাত্রীদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। খেতে খেতে ছাত্রছাত্রীরা শোনাচ্ছিলেন ঃ 'আমরা দুটো লাল সালু পেতে এ আই ডি এস ও'র ব্যানার নিয়ে মানুষের কাছে গিয়েছি। শ্রমিকদের প্রতি সীমাহীন বঞ্চনা ও ধর্মঘটের কথা বলেছি। বলেছি — ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে আমরা এস ইউ সি আই-এর ছাত্র সংগঠন ডি এস ও'র পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি।' শ্রমিকদের লড়াইয়ের পাশে ছাত্ররা এসে দাঁড়িয়েছে দেখে মানুষ খুশি; তাঁরা সাহায্য দিয়েছেন, আর ধিক্কার জানিয়েছেন দালাল ইউনিয়নের নেতাদের উদ্দেশে।

২২ বছরের দুই তরুণ শ্রমিক কমলেশ ও চন্দন বললেন, তাঁরাও যখন মিলের গেটে ও গ্রামে গ্রামে চাল ডাল সংগ্রহ করতে যান তখনও সবাই তাদের সংগ্রামকে উৎসাহ দিচ্ছেন, সাহায্য করছেন। সাধারণ মানুষ তাদের লড়াইয়ের পক্ষে।

ছাত্রছাত্রীদের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে নিজেদের আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলে ধরলেন বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক বি ভাস্কর রাও। বললেন, 'হুগলির এই বাঁশবেড়িয়াতে দ্য গ্যাঞ্জেস জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির দুটো ইউনিট ছিল। সিটু, ইনটাকের মত ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে এক চুক্তি করে কোম্পানি ১

আটের পাতায় দেখুন

গ্যাঞ্জেস শ্রমিকদের ভাতে মারার চক্রান্ত

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ১৯ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন,

''গ্যাঞ্জেস জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেডে ইতিপূর্বে ধর্মঘট চলাকালীন মালিকপক্ষ, গত ১০ জানুয়ারি শ্রমিকদের স্থায়ী কাজে ঠিকা শ্রমিক মেনে নিতে হবে, উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে, শ্রমিক সংখ্যা কমাতে হবে, ইত্যাদি শ্রমিকস্বার্থবিরোধী শর্ত সম্বলিত একটি পুস্তিকা দেয়। জুট শিল্পে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হওয়ার পর মালিকপক্ষ হঠাৎ দু-তিন দিনের জন্য এখানে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক জারি করে এবং মালিকের সেবাদাস সিটু, আইএনটিইউসি ইউনিয়ন চুঁচুড়া এসডিও অফিসে এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করে বলে যে, মালিকের এই দাবি সম্বন্ধে আলোচনা করে এক মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবে। অথচ, জুট শিল্পে বিগত ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে বলা আছে দ্বিপাক্ষিক নয়, ত্রিপাক্ষিক স্তরে অর্থাৎ লেবার কমিশনার দপ্তরে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মালিকপক্ষের এই সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ জারি আসলে সাড়ে পাঁচ হাজার শ্রমিককে ভাতে মারা এবং মালিকপক্ষের বেআইনি কাজগুলি শ্রমিকদের দিয়ে মানিয়ে নেওয়ার অপচেষ্টা মাত্র। এই নোটিশ দেখার পর শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর উদ্যোগে এর বিরুদ্ধে এলাকায় শ্রমিকরা মিছিল করলে সেই মিছিলের ওপর সিটু আশ্রিত সমাজবিরোধীরা হামলা করে। সমস্ত বিষয়টিই আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি। প্রসঙ্গত এই মালিকেরই পাশের মিল গ্যাঞ্জেস জুট প্রাইভেট লিমিটেড বেআইনিভাবে অ্যাপ্রেনটিশ নাম দিয়ে কম বেতনে পুরো উৎপাদন করিয়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে ৩ হাজার শ্রমিক ৪ নভেম্বর ২০০৬ থেকে লাগাতার ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে সিটু, আইএনটিইউসি আশ্রিত সমাজবিরোধীদের হাতে আক্রান্ত হচ্ছে শ্রমিকরা। পুলিশও মিথ্যা মামলায় ফাঁসাচ্ছে। আমরা ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পক্ষ থেকে অবিলম্বে শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করছি, শ্রমআইন লঙ্ঘনকারী মালিকের শাস্তি দাবি করছি এবং এলাকায় সিটু আশ্রিত সমাজবিরোধীদের তাণ্ডব বন্ধ করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করছি।''

উল্লেখ্য, জুট শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে ২১ এপ্রিল বাঁশবেড়িয়া হাইস্কুলে গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ডানলপ ও বন্ধ উইনডো গ্লাসের শ্রমিক-কর্মচারীরাও তাতে যোগ দেন। মালিক ও সিটুর জুলুমের প্রতিবাদে ২৫ এপ্রিল ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর ডাকে বাঁশবেড়িয়া সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়।

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে বিশ্বকে মুক্ত করতে না পারলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং থেকেও মানবজাতির মুক্তি নেই

চারের পাতার পর

মানুষের মধ্যে ভোগবাদী কালচার, অর্থাৎ ভোগলালসা চরিতার্থ করার মানসিকতা সৃষ্টি করছে, যাতে মানুষ তার নিত্যদিনের সংসারের সামান্য খরচটুকুকেও কাটছাঁট করে ওদের পণ্য কিনতে প্রলুব্ধ হয়। কী ভয়ঙ্কর সেই প্রলোভন দেখুন! এ প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট উদাহরণই যথেষ্ট। দরিদ্র পরিচারিকা এক মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালান, মেয়েকে স্কুলে পড়ান। তিনি সম্প্রতি মেয়েকে স্কুল ছাড়িয়ে অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজে লাগিয়েছেন। কারণ, বাড়িতে তিনি একটি রঙিন টিভি কিনেছেন, কিস্তিতে তার দাম শোধ করতে হবে। নিজেদের পণ্যের বাজার বাড়াতে পুঁজিপতিশ্রেণী মানুষকে কোথায় ঠেলে দিচ্ছে!

পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা— কে কত কম খরচে পণ্য উৎপাদন করে সবচেয়ে বেশি মুনাফা করতে পারে। ফলে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে মুনাফা অর্জনের বিষয়টি ভাববার সুযোগ তাদের নেই। এই মুহূর্তের, অর্থাৎ আশু মুনাফাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। পরে কী হবে— তা ভাবার অবকাশ নেই। তাই আশু সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য যত নীচে নামতে হয় তারা নামছে। সর্বোচ্চ মুনাফাই তাদের স্বর্গ, তাদের ধর্ম, তাদের জীবন। দূষণ নিয়ন্ত্রণের যে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের দাবি উঠছে— তা ব্যবহার করতে হলে তো অর্থ খরচ করতে হবে; সেই প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করার জন্য গবেষণা করতে হলে তাতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে। অথচ তা থেকে আশু কোন মুনাফা হবে না, শুধু খরচ। অর্থাৎ, মুনাফার হারে টান পড়বে। ২ ফেব্রুয়ারি প্যারিসে পরিবেশবিজ্ঞানীদের সম্মেলনের রিপোর্টের পর ১৩ ফেব্রুয়ারি এক্সন মোবিল কোম্পানির সি.ই.ও টিলারসন রাখঢাক না করেই বলেছেন, ''নানা বিস্তৃত ক্ষেত্রে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের সুবিধা যে আর্থিক লাভ নিয়ে আসছে, কোন বিকল্প শক্তির ব্যবহার তার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারে না।'' তাই মার্কিন শাসকরা বলছে— দূষণ নিয়ন্ত্রণের কিয়োটো চুক্তিপত্র মানলে তাদের দেশের অর্থনীতির ক্ষতি হবে। মানে কী? মানে হল, সে দেশের কর্পোরেট সংস্থাগুলির অর্থাৎ পুঁজিপতিশ্রেণীর সর্বোচ্চ মুনাফার হারে খানিকটা টান পড়বে। সেটুকুও তারা মানতে রাজী নয়। আমেরিকার খনিজ তেলের একটি কোম্পানি ২০০১ সালে জাপানে কিয়োটো সম্মেলনের আগের মাসগুলোতে টেলিভিশনে বিজ্ঞাপনের একটি সিরিজের জন্যই শুধু খরচ করেছে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার; এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তারা মার্কিন নাগরিকদের সতর্ক করার চেষ্টা করেছে যে, যদি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমণ রোধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় তবে মার্কিন অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, এই সংস্থার এক প্রতিনিধি বৃহৎ শিল্পলবির পক্ষ থেকে কিয়োটো সম্মেলনে পর্যন্ত হাজির হয়েছিলেন এবং শুনিয়েছিলেন, ''আমরা মনে করি, গ্রিনহাউস গ্যাস রোধে এই সম্মেলনে গৃহীত হতে পারে এমন যে কোন সময়সীমার বিরুদ্ধে মার্কিন জনগণের মনে আমরা প্রচুর প্রশ্ন ঢুকিয়ে দিয়েছি.... যা আমরা করছি এবং সফলতার সঙ্গেই চিন্তা করছি যে, এইভাবে কথাবার্তা চালাতে চালাতেই আমরা আমাদের শিল্পকারখানার চলতি ব্যবস্থাকে আরও অনেক কাল জিইয়ে রাখতে পারবো।'' এরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে গতবারে জর্জ বুশের পক্ষে যে পরিমাণ অর্থ ঢেলেছিল, তা ইতিপূর্বে কোন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ঢালেনি। বোঝা যায়, বহুজাতিক কোম্পানিগুলির এই শিল্পলবির হাত কত লম্বা ও কত সক্রিয়! ফলে তেলের লবির মুনাফার স্বার্থে বড় বড় রাজনীতিবিদ এবং দুর্বল চরিত্রের অর্থলিপ্সু বিজ্ঞানীদের কিনে নেওয়াটা যে এদের কর্মসূচিরই অঙ্গ হবে— সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই (সূত্র ঃ ফ্রন্টলাইন, ৯ মার্চ ২০০৭)।

সব পুঁজিবাদী দেশের সরকারের এক রা। পুঁজিপতিদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য তারা প্রয়োজনে পরিবেশের আরও দূষণ ঘটাবে, আফগানিস্তান বা ইরাকের যুদ্ধের মত আরও যুদ্ধের সৃষ্টি করবে, পরিবেশে আরও গ্রিনহাউস গ্যাস ঢেলে দেবে, আরও অসংখ্য কার্গিল যুদ্ধের আবহাওয়া রচনা করবে; কিন্তু মুনাফা কমিয়ে পরিবেশ সুরক্ষার পথ, মানুষকে বাঁচানোর পথ তারা মাড়াবে না। মুনাফার লালসাই তাদের আরও পরিবেশ ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে। পৃথিবীর আয়ু আর মাত্র ৯০ বছর— বিজ্ঞানীদের থেকে এই হুশিয়ারি শুনেও পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের তাঁবেদার সরকারগুলির বিন্দুমাত্র টনক নড়বে না, কোন স্পন্দন অনুভূত হবে না তাদের বিবেকে। কারণ, একমাত্র মুনাফাই তাদের বিবেক।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই পারে পরিবেশকে রক্ষা করতে

এর বিপরীতে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিকল্পিত অর্থনীতি; সেখানে ব্যক্তি-পুঁজির খবরদারি চলে না, সেখানে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের মুনাফা লুণ্ঠনের সুযোগ থাকে না, সেখানে জনগণের স্বার্থরক্ষাই রাষ্ট্র ও সরকারের একমাত্র লক্ষ্য এবং সেখানেই একমাত্র পরিবেশকে দূষণ ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব। একমাত্র সমাজতন্ত্রই উন্নত আদর্শে উদ্বুদ্ধ মানুষ তৈরি করে মানুষের ভোগস্পৃহা এবং প্রকৃতির দেওয়ার ক্ষমতার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করতে এবং প্রকৃতিকে মাত্রাতিরিক্ত দোহন থেকে রক্ষা করতে পারে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণ-প্রজাতন্ত্রী চীন সেই দৃষ্টান্ত স্থাপনও করেছিল।

রুশ বিপ্লবের পর সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ছিল পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা অবরুদ্ধ অত্যন্ত পিছিয়ে-পড়া একটি দেশ। আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের থেকে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশকে রক্ষা করতে মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিনের নেতৃত্বে দ্রুত শিল্পায়নের পথে যেতে হয় সোভিয়েতকে। অনিবার্যভাবেই প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হয়। লক্ষণীয়, তখনও কিন্তু আবহমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে ওঠার কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষণ ফুটে ওঠেনি এবং বিজ্ঞানীরাও সে বিষয়ে তখনও কোন হুঁশিয়ারি দেননি, যেটা তাঁরা দিয়েছেন ১৯৫০ সালের পর। তবু মার্কসবাদী বিচারধারার আলোকে সমাজতন্ত্রের জনকল্যাণকর কর্তব্যটি বুঝতে কমরেড স্ট্যালিনের কোন ভুল হয়নি। ফলে, শিল্প স্থাপনের পাশাপাশি প্রাকৃতিক ক্ষতি পুষিয়ে দিতে মস্কো সহ অন্যান্য শহরগুলিকে গাছে গাছে ভরে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে পর্যটকরা সোভিয়েতে গিয়ে রাজধানী মস্কোর প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছেন। কিন্তু ১৯৫৪ সালে কমরেড স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত নেতৃত্ব মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহান আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে শোধনবাদী পথে যাত্রা করে এবং রাশিয়ায় শেষ পর্যন্ত মুনাফালিপ্সু পুঁজিবাদকেই ফিরিয়ে আনে। ফলে, সেখানেও এখন চলেছে প্রকৃতিলুণ্ঠন।

বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চীন স্বাধীনতা লাভ করে আমাদের ভারতের স্বাধীনতারও পরে। ৫০-এর দশকে তখন আবহমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাবজনিত উষ্ণতাবৃদ্ধির বিষয়টি সুস্পষ্ট ও প্রকট হতে শুরু করেছে। মহান মার্কসবাদী নেতা কমরেড মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে বিপ্লবী চীন গবেষণা চালিয়েছিল— বেড়ে চলা গ্রিনহাউস গ্যাস কোন্ কোন্ গাছ সবচেয়ে বেশি শুষে নিয়ে প্রকৃতিকে নিষ্কলুষ করতে পারে — তার ওপর, এবং তারা এই পথে অনেকদূর এগিয়েছিল বলেও জানা গেছে। কোন পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়নি। কারণ এর পিছনে কোন মুনাফা নেই। কিন্তু ১৯৭৬ সালে কমরেড মাও-এর মৃত্যুর পর প্রতিক্রিয়াশীল শোধনবাদীরা চীন রাষ্ট্রের নেতৃত্ব কব্জা করে এবং মহান চীনকে টেনে আনে পুঁজিবাদের পঙ্কিল পথে। সেকারণে, মানবজাতিকে রক্ষার স্বার্থে প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষার মহান উদ্যোগ চীনেও বন্ধ হয়ে গেছে শুধু নয়, প্রকৃতিকে লুণ্ঠন করে মুনাফা লোটার রাস্তা খুলে দেওয়া হয়েছে পুঁজিপতিদের কাছে।

ফলে, এখন যদি কেউ ভাবে যে, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দরকার নেই, শুধুমাত্র পরিবেশ-আন্দোলন করে পরিবেশকে রক্ষা করা যাবে— তাহলে তা হবে নিছক অজ্ঞতারই নামান্তর। মনে রাখতে হবে, উষ্ণায়নের এই সমস্যা কোন প্রযুক্তির অভাববশত, বা চেষ্টার অভাবজনিত— তা কিন্তু নয়। এর পেছনের মূল কারণ— নির্লজ্জ মুনাফালোভী পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক। এই উৎপাদন-সম্পর্কই উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে ও প্রকৃতিকে নিষ্কলুষ করার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে, দেশে দেশে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ দাপিয়ে বেড়াবে, অথচ পরিবেশে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ না বেড়ে বরং কমতে থাকবে, ভয়াবহ দূষণ তথা ধ্বংসের হাত থেকে পৃথিবীর মানুষ রক্ষা পেয়ে নিশ্চিন্তে বাঁচবে— এ হয় না, হতে পারে না। এ হল অলীক কল্পনা। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করতে না পারলে, দেশে দেশে পুঁজিবাদকে হটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে দিতে না পারলে মানবজাতির মুক্তি নেই। পুঁজিবাদ তার শোষণ-লুণ্ঠন শুধু মানবজাতির ওপর চালায় না, সর্বোচ্চ মুনাফার লালসায় সে প্রকৃতিকেও লুঠ করে, ধ্বংস করে। তাই পরিবেশ তথা মানব জাতিকে বাঁচাতে হলে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ঘটাতেই হবে এবং পরিবেশরক্ষার আন্দোলনকে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের সংগ্রামের পরিপূরক করেই গড়ে তুলতে হবে।

তরুণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি ব্লকের হুদুমডাঙা গ্রামের এস ইউ সি আই-এর একনিষ্ঠ তরুণ কর্মী কমরেড রবীন্দ্রনাথ রায় গত ১২ এপ্রিল আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩২ বছর। ছাত্র অবস্থাতেই তিনি সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ এলাকায় দলের সাংগঠনিক কাজে যুক্ত হন। পরে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মহকুমা আদালতে আইন পেশায় নিযুক্ত হলেও দলের কাজকর্মকে সর্বদাই প্রাধান্য দিতেন। ফ্রন্ট সরকারের ভ্রান্ত ভাষাশিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা, সীমান্তের বহুবিধ সমস্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের ফ্রি-কোচিং দেওয়া, গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হওয়া, গরিব মানুষের মামলা-মোকদ্দমায় আইনি সাহায্য দেওয়া ইত্যাদি নানাবিধ কাজে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রণী। দলের আদর্শ যেমন নিজের জীবনে প্রয়োগ করতেন, তেমনই পরিবারকেও উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতেন।

খেতে কাজ করতে করতে হঠাৎ তাঁর বুকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হলে হাসপাতালে আনার পথেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মরদেহ হলদিবাড়ি দলীয় কার্যালয়ে আনা হলে উপস্থিত কমরেডরা চোখের জলে তাঁকে বিদায় জানান। দলের কোচবিহার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রুহুল আমিন প্রয়াত কমরেডের মরদেহে মাল্যদান করেন।

কমরেড রবীন্দ্রনাথ রায়ের মরদেহ গ্রামের বাসভবনে নিয়ে গেলে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। গ্রামের খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের আপনজন এই তরুণ কর্মীটির সঙ্গে সকলের যে নিবিড় সম্পর্ক ছিল তা পরিলক্ষিত হয় পরের দিন সকালে তাঁর অন্তিম যাত্রায়। এদিন যেমন দলের পার্টি কর্মীরা সুশৃংখলভাবে তাঁর শেষযাত্রায় সামিল হন, তেমনি অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী, গ্রামের মহিলা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দও এই শেষযাত্রায় যোগ দেন। দেওয়ানগঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড মজিরদ্দিন সরকার ও অন্যান্য সদস্যরা প্রয়াত কমরেডের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বৈপ্লবিক অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। এই তরুণ কর্মীর অকাল মৃত্যুতে দল একজন নিষ্ঠাবান সৎ ও দক্ষ কর্মীকে হারাল।

কমরেড রবীন্দ্রনাথ রায় লাল সেলাম

ট্রেনে হকার উচ্ছেদ নিয়ে
হাইকোর্টের রায় অমানবিক
ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী

ট্রেনের কামরায় এবং প্ল্যাটফর্মে হকারি বন্ধ করার জন্য হাইকোর্ট থেকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পক্ষে হকার সংগ্রাম কমিটির সহসভাপতি বিধান চ্যাটার্জী ১৯ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন —

''সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট ট্রেনে হকারি নিষিদ্ধ করে যে রায় দিয়েছেন, আমরা মনে করি, তা সম্পূর্ণ অমানবিক। এই রায় লক্ষ লক্ষ হকার পরিবারকে অনাহারে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। এছাড়া, এই রায় কার্যকর হলে অসামাজিক কার্যকলাপ বেড়ে যাবে বলে আমাদের আশঙ্কা। ফলে, এই রায়ের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষকে সোচ্চার হতে আহ্বান জানাচ্ছি।''

হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির নিন্দা

সারা বাংলা হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক শঙ্কর দাস ১৮ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেছেন — ''গতকাল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ট্রেনের ভেতরে ও রেল স্টেশনে লাইসেন্সহীন হকারদের হকারি বন্ধ করার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা কার্যকর হলে হাজার হাজার পরিবার বিপর্যয়ের সামনে পড়বে। আমরা হাইকোর্টকে এই দিকটা বিচার করার জন্য এবং লাইসেন্সহীন হকারদের জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থা করার জন্য সরকারকে নির্দেশ দিতে আবেদন করছি। হকার বিরোধী এই রায় যাতে কার্যকর না হয় তার জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে আবেদন করছি। সাথে সাথে সর্বস্তরের হকার ও হকার সংগঠনকে এই রায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য এবং রায় পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।''

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

কেন্দ্রীয় সরকারের আগেই এ রাজ্যে সিপিএম সরকার এসইজেড আইন পাশ করেছে

শিল্পের ছলে দেশি-বিদেশি পুঁজির মুনাফা লুটের জন্য ভারতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির প্রস্তাব প্রথম বিজেপি পরিচালিত এনডিএ সরকারের সময়ই তোলা হয়। তারা এ সম্পর্কে একটা মডেল আইনের খসড়া তৈরি করে রাজ্যগুলিকে বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছিল। কেন্দ্রীয়ভাবে বিজেপি সরকার সেই খসড়া আইনকে চূড়ান্ত রূপ দিতে পারেনি। বিজেপি'র সেই অসমাপ্ত কাজটি সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নেয় পরবর্তীকালে কেন্দ্রে আসীন কংগ্রেসের ইউপিএ সরকার, যার অস্তিত্ব আজও সিপিএমের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। ২০০৫ সালে ইউপিএ সরকার এসইজেড আইন পাশ করায়। বলা বাহুল্য, সিপিএমের সমর্থনেই এই বিল পাশ হয়েছে। পার্লামেন্টে সিপিএম সমর্থন না করলে এসইজেড বিল পাশ হতে পারত না।

সিপিএম সরকার গণপ্রতিরোধের মুখে পড়লেই অজুহাত দেয়, ''কেন্দ্র আইন করেছে, রাজ্যের না মেনে উপায় নেই।'' চরম জনবিরোধী বিদ্যুৎ-আইন ২০০৩-এর প্রশ্নেও এই অজুহাত তারা দেখিয়েছিল। তাদের এই মিথ্যাচারের মুখোশ খুলে দিয়ে আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি যে, কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার বিদ্যুৎ আইন পার্লামেন্টে পাশ করাবার আগেই সিপিএম সরকার এ রাজ্যে বিদ্যুৎ আইনের জনবিরোধী ধারাগুলি চালু করে দেয়।

এসইজেডের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ২০০০ সালে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার একটা মডেল আইন তৈরি করে রাজ্য সরকারগুলির মতামতের জন্য পাঠায়। রাজ্য সরকারগুলির ক্ষেত্রে সেইমতো রাজ্য-আইন করার কোনও বাধ্যবাধকতা দূরের কথা, প্রস্তাবও ছিল না। অন্য কোনও রাজ্য সরকার তখনও তেমন কোনও আইনও করেনি। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম সরকার সর্বাগ্রে উদ্যোগী হয়ে ২০০৩ সালের ৯ ডিসেম্বর রাজ্য বিধানসভায় এসইজেড বিল পেশ করে এবং সকল বিরুদ্ধতা উপেক্ষা করে এমএলএ সংখ্যার জোরে তা পাশও করিয়ে নেয়। এই আইনে পরিষ্কার বলা আছে, এসইজেড-কে বিদেশি ভূখণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে। আরও লক্ষণীয় হল, এরাজ্যে সিপিএম যখন এসইজেড আইন করার কৃতিত্ব গর্বভরে প্রচার করে দেশীয় একচেটিয়া পুঁজি ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির প্রশংসা কুড়োচ্ছিল, ঠিক সেসময় দিল্লিতে ও অন্যান্য রাজ্যে সিপিএম নেতারা এসইজেডকে 'বিশেষ শোষণের অঞ্চল' বলে বিবৃতি দিয়ে লড়াকু ভাব দেখাচ্ছিলেন। এই দ্বিচারিতাই সিপিএমের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য।

২০০৩ সালের ৯ ডিসেম্বর বিধানসভায় বিলটির উপর আলোচনা শুরু হতেই এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার তার তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, এই বিল পশ্চিমবাংলার শ্রমজীবী জনগণের ট্রেড ইউনিয়ন করার মৌলিক অধিকার হরণ করে মালিকশ্রেণীর অবাধ ও নির্মম শোষণ লুণ্ঠনের স্বার্থে আনা হয়েছে। পশ্চিমবাংলার সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এটি অত্যন্ত কলঙ্কজনক একটি কালা বিল।

দেবপ্রসাদ সরকার বলেন, এই রাজ্য সরকার বিশ্বায়ন, উদারীকরণ, বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে বলছে, কয়েকদিন আগেই (৫/১২) এই বিধানসভাতেই বিশ্বায়নবিরোধী একটি প্রস্তাবও রাজ্য সরকারের সমর্থনে পাশ করানো হয়েছে। তারপর আজকের এই কালা বিল যা বিশ্বায়নের অঙ্গরূপে বৃহৎ পুঁজির স্বার্থেই কাজ করবে, তা আনা হয় কী করে? এ তো চরম স্ববিরোধিতা!

বিলের প্রস্তাবনায় মন্ত্রী বলেছেন, 'আর্থিক সংস্কার'কে ত্বরান্বিত করার জন্যই এই বিল আনা হয়েছে। আমার প্রশ্ন — তথাকথিত এই 'আর্থিক সংস্কার' কাদের স্বার্থে, কোন্ শ্রেণীর স্বার্থে দেশে আনা হয়েছে? এই সংস্কার মানে তো শ্রমজীবী জনগণের সংহার! একদিকে এই এসইজেড-এ স্থাপিত ইউনিটগুলোকে বিপুল কর ছাড় দেওয়া হবে, অন্যদিকে, দেশের 'শিল্পবিরোধ আইন' 'শ্রম আইন' বিশেষ অঞ্চলে কার্যকর হবে না। যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে মালিকশ্রেণী যত নির্মম শোষণই চালাক, তার বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারও থাকবে না। আমি এই কালা বিলের তীব্র বিরোধিতা করছি।*

বলা বাহুল্য, কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধতা অগ্রাহ্য করে সিপিএম বিধানসভায় সংখ্যাধিক্যের জোরে এই কালা বিল পাশ করিয়ে নেয় এবং দেশিবিদেশি পুঁজিপতিদের ঐ আইনটি দেখিয়ে বোঝায় যে, তাদের স্বার্থ দেখতে সিপিএম সরকার, এমনকী কংগ্রেস, বিজেপি চালিত রাজ্য সরকারগুলির চেয়েও কত অগ্রণী।

* কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের বক্তব্য বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে তুলে দেওয়া হল।

কমরেড দাশরথি মণ্ডল চরিত্রগুণেই আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন

স্মরণসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড দাশরথি মণ্ডল (দাশুবাবু) ৭৫ বছর বয়সে গত ১ এপ্রিল ক্যানিং হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর স্মরণে দলের ক্যানিং শাখার উদ্যোগে সভা অনুষ্ঠিত হয় ক্যানিং গোবিন্দ টকিজ প্রেক্ষাগৃহে ১০ এপ্রিল সকাল ৯টায়। দলের কর্মী-সমর্থক-দরদী ও দাশুদার

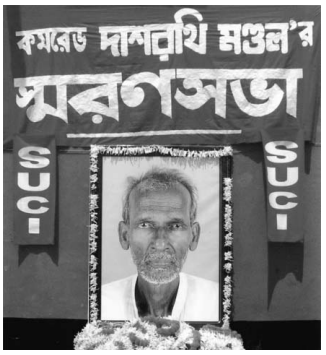

প্রতি শ্রদ্ধাশীল সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে যায়। হলের বাইরেও বহু মানুষ ছিলেন। মাল্যদানের জন্য বাইরে দাশুবাবুর একটি ছবি রাখা হয়। সকাল থেকেই সেখানে দলের ও গণসংগঠনগুলির বিভিন্ন ইউনিট, সাধারণ মানুষ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে স্মরণসভার কাজ শুরু হয়। হলের ভিতরে স্থাপিত প্রয়াত কমরেড দাশরথি মণ্ডলের ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান প্রধান বক্তা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর প্রবীণ সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর এবং সভার সভাপতি রাজ্য কমিটি ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার। উপস্থিত রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সলিল চক্রবর্তী ও কমরেড সুজিত ভট্টশালী এবং কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। জেলা কমিটির পক্ষে মাল্যদান করেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী, ক্যানিং শাখার পক্ষে কমরেড বাদল সরদার, পার্টির ক্যানিং শহর কমিটির পক্ষে কমরেড সেকেন্দার জমাদার এবং পার্টি অফিসের পক্ষে কমরেড সুশান্ত ঢালি।

প্রধান বক্তার ভাষণে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, দাশরথিবাবুর মৃত্যুসংবাদ শুনে আমি নিজেই বলেছি, স্মরণসভায় আমি আসব। কারণ দাশুদার প্রতি আমার বরাবরই বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। আজ সকালে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে দেখলাম কমরেড রণজিৎদা আসছেন। এখানে এসে দেখেছি কমরেড সলিল চক্রবর্তী, সুজিত ভট্টশালী এসেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই এসেছেন একটিই কারণে, দাশুবাবু নিজের চরিত্রগুণে এঁদের মনেও একটা শ্রদ্ধার স্থান করে নিয়েছিলেন। দাশুদা কোথাও বক্তৃতা করেননি, কাগজে তাঁর নাম বা ছবি কখনও ছাপা হয়নি, দলের নেতাও তিনি ছিলেন না, তবুও তাঁর প্রতি এই যে শ্রদ্ধা ও টান, এটা চরিত্রের একটা বড় দিক নির্দেশ করে।

শরৎ সাহিত্যে আমরা গিরীশ, গোকুল, রমেশ, বৃন্দাবনের মতো চরিত্র পেয়েছি। আমাদের শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, এই ধরনের চরিত্রগুলোই বিকাশের পথে যথার্থ কমিউনিস্ট চরিত্রের অধিকারী হতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ধর্মীয় মূল্যবোধ, মানবতাবাদী মূল্যবোধ, যা একটা ধারা হিসাবে কাজ করেছিল, আজ সেটা প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। দাশুবাবু দলে আসার আগে সেই মূল্যবোধের মানুষ ছিলেন। অপরের বিপদে ছুটে যাওয়া, নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করা, অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করা, গরিব মানুষের প্রতি দরদ ও সহানুভূতি — এইসব গুণগুলি ছিল বলেই তিনি বিত্তবান ঘরের সন্তান হয়েও এস ইউ সি আই-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের 'চাষী আন্দোলন প্রসঙ্গে' বইটি তাঁর হৃদয়ে এমন আলোড়ন তুলতে পেরেছিল সেজন্যই। এধরনের মানুষরা আজকের যুগে যদি সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে নিজেকে যুক্ত না করেন, তাহলে চরিত্রের গুণাবলী ধরে রাখতে পারবেন না, হয় বাস্তব পরিস্থিতির চাপে আপস করে করে মূল্যবোধ হারাবেন, আর সেটা না পারলে হয় সিনিক, না হয় পাগল হবেন।

তিনি বলেন, পার্টিতেও দাশুবাবুর স্থান ছিল অতীতের যৌথ পরিবারের দাদার মতো — সকল কমরেডের তিনি ছিলেন অভিভাবক, ছোটদের প্রতি পরম স্নেহশীল। জমিদার পরিবারের সন্তান হয়ে চাইলে তিনি এ সমাজে 'প্রতিষ্ঠা' বলতে যা বোঝায় তা পেতে পারতেন। এই অঞ্চলে যাঁরা সরকারি দলের রাজনীতি 'কন্ট্রোল' করেন, তাঁরা দাশুবাবুর বন্ধু-বান্ধব, তিনি তাদের পথেও যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি বেছে নিয়েছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ — কষ্টকর সংগ্রামের পথ। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই পথেই তিনি অবিচল ছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন — অল্প হোক, কিন্তু খাঁটি লোক চাই। শুধু সুন্দর সাজানো বক্তৃতা নয়, গুরুগম্ভীর লিখতে পারা নয়, আসল প্রয়োজন চরিত্রের সাধনা। অতীতে যখন আমাদের পার্টির প্রভাব ততটা ছিল না, তখন দাশুবাবুদের মতো যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের চরিত্রের একটা স্ট্যান্ডার্ড ছিল। আজ প্রভাব বেড়েছে, কর্মীও আসছে অনেক। যাঁরা আসছেন তাদের বলব, বিপ্লবী আন্দোলনে কেমন চরিত্র চাই তা বুঝতে হলে দাশরথি মণ্ডলের মতো কমরেডদের জীবন সংগ্রামকে জানতে হবে।

সভাপতি কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ছাড়া স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড বাদল সরকার ও কমরেড ইয়াহিয়া আখন্দ। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে স্মরণসভা শেষ হয়।

বাঁশবেড়িয়া গ্যাঞ্জেস জুট মিল শ্রমিকদের লাগাতার সংগ্রাম

ছয়ের পাতার পর

নম্বর ইউনিটের নাম পাল্টে করে গ্যাঞ্জেস জুট প্রাইভেট লিমিটেড, যাতে এই মিলের নতুন শ্রমিকদের কম মজুরিতে খাটানো যায়। এরপর থেকেই নতুন নামওয়ালা এই কারখানায় শ্রমিকদের শিক্ষানবিশ বলে চালানো হচ্ছে এবং ৭৩ টাকা মজুরিতে খাটানো হচ্ছে। অথচ শ্রমিকরা 'ফুল প্রোডাকসন' দিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাহলে শিক্ষানবিশ কী করে? আমরা দাবি করেছি — আমাদের শ্রমিক হিসাবে মান্যতা দিতে হবে, পুরো বেতন দিতে হবে। সেই দাবিতেই আমাদের ধর্মঘট চলছে। আর সেটা ভাঙতে ৭টি ইউনিয়ন ও ম্যানেজমেন্ট এখানে জঙ্গলরাজ কায়েম করে রেখেছে।' তিনি বলেন, '২০০২-এর ৮ মার্চ রাজ্য শ্রমমন্ত্রীর ঘরে বসে ৭টি ইউনিয়ন ও মালিকের মধ্যে এক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাতে শ্রমিকদের বেতন ১০০ টাকা করা হয়। তখন চাল ও আটার দাম ছিল ৭ টাকা, ৮ টাকা কেজি। আজ ২০০৭ সাল চলছে। কোম্পানি সেই চুক্তি আজও মানছে না। তবু ৭টি দালাল ইউনিয়ন তাদের পক্ষে, সরকার-পুলিশ-প্রশাসনও কোম্পানির পক্ষে।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শান্তি ঘোষ সুনির্দিষ্ট হিসেব দিয়ে গণদাবীর প্রতিনিধিকে জানালেন, ২০০২-এর চুক্তি অনুযায়ী দৈনিক মজুরি হয় ১০০ টাকা, দৈনিক ডিএ ৪৬.০৩ টাকা, ৫ শতাংশ হারে ঘরভাড়া ভাতা ৭.৩০ টাকা। অর্থাৎ শ্রমিকদের মোট প্রাপ্য দাঁড়ায় (১০০.০০+৪৬.০৩+৭.৩০) ১৫৩ টাকা ৩৩ পয়সা। এর ওপর আছে প্রভিডেন্ট ফান্ড, চিকিৎসার খরচ, ই এস আই এবং গ্র্যাচুইটি। অথচ কোম্পানি দিচ্ছে মাত্র ৭৩ টাকা। অর্থাৎ কোম্পানি প্রতি শ্রমিকের থেকে প্রতিদিন অন্তত ৮০ টাকা ৩৩ পয়সা চুরি করছে দালাল ইউনিয়ন ও পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্যে।

কারখানার গেটে নোটিস দিয়েছে কোম্পানি — ৭২ ঘণ্টার মধ্যে শ্রমিকরা কাজে যোগ না দিলে সবাইকে সাসপেন্ড করা হবে। নোটিশ দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন শ্রমিকরা। ইতিমধ্যে খবর আসে ১নং ইউনিটে ৫ জন শ্রমিককে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে শ্রমিকরা সেখানে কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। সন্ধ্যায় মিছিল বের করে ধর্মঘটী শ্রমিকরা শ্রমিক মহল্লাগুলিতে ঘোরেন। তাঁদের স্লোগানের ধ্বনিতে সচকিত হয়ে ওঠে মহল্লা ঃ 'ছাঁটাইয়ের ধমকি দিয়ে মিলের চাকা ঘোরানো যাবে না', '১নং ইউনিটের বরখাস্ত শ্রমিকদের পুনর্বহাল করতে হবে, শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ।'

সেই মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন গণদাবীর প্রতিনিধিও। মিছিলে হাঁটা ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নেতা কমরেড শান্তি ঘোষকে ডেকে ১নং ইউনিটের এক শ্রমিক বলেন, — মালিককে ভাল করে চাপ দিন এবং আপনারাই সেটা পারবেন, আর সব দালাল হয়ে গিয়েছে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in